শ্রেষ্ঠ গল্প

শিবরাম চক্রবর্তী



শ্রেষ্ঠ গল্প

শিব্রাম চক্রবর্তী

নন্দিতা পাবলিশার্স

প্রাপ্তিস্থান : বুকফ্রেণ্ড, ৮/১/বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ
রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র
৮/১/বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ ঃ পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়
আরতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৯, ডি/এইচ/১৬, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য ঃ ১৫ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

ছারপোকার মাড়

ছারপোকা আমি মারি নে। মারতে পারি নে। মারতে মারতে হাতব্যথা হয়ে যায় কিন্তু মেরে ওদের শেষ করা যায় না।

তাছাড়া, মারলে এমন গন্ধ ছাড়ে! বিচ্ছিরি! শহীদ হয়ে ওরা কীর্তির সৌরভ ছড়ায় এমন—আমার কীর্তি আর ওদের সৌরভ—যাতে আমাদের উভয় পক্ষকেই ঘায়েল হতে হয়।

প্রাণ দিয়ে ওরা আমাদের নাক মলে দিয়ে যায়। যা নাকি কানমলার চেয়েও খারাপ।

এই কারণেই আমি ছারপোকা কখনো মারি নে।

আমার হচ্ছে সহাবস্থান। ছারপোকাদের নিয়ে আমি ঘর করি। আত্মীয়স্বজনের মতোই একসঙ্গে বাস করি তাদের নিয়ে।

আমার বিছানায় হাজার-হাজার ছারপোকা। লাখ-লাখও হতে পারে। এমন কি কোটি-কোটি হলেও আমি কিছু অবাক্ হব না।

কিন্তু তারা আমায় কিছু বলে না।

আমিও তাদের মারি নে, তারাও আমায় কামড়ায় না। অহিংস-নীতির, গান্ধীবাদের উজ্জ্বল আবাদ আমার বিছানায়।

আমি করেছি কি, একটা কম্বল বিছিয়ে দিয়েছি আমার বিছানায়। কম্বলের ঝুল চৌকির আধখানা পায়া অবধি গড়িয়েছে।

চৌকির ফাঁকে-ফোকরে তো ওদের অবস্থান। আমার গায়ে এসে পড়তে হলে তাদের কম্বলের এবড়োখেবড়ো পথ ভেঙে আসতে হবে। আসতে হবে পশমের জঙ্গল ভেদ করে।

কিন্তু সেই উপশমের উপর নির্ভর না করেও আমি আর-একটা কৌশল করেছি। চৌকির চারদিকে কম্বলের ঝুল-বরাবর ফিনাইলের এক পোঁচ লাগিয়ে দিয়েছি। রোজ রাত্রেই শোবার আগে নিপুণ

তুলির দক্ষতায় একবার করে লাগাই। তাই দিয়ে কম্বলের তলার দিকটা কেমন চটচটে হয়ে গেছে। হোক গে, তাতে আমার চটবার কোন কারণ নেই। ফিনাইলের গন্ধ, আমার ধারণা, মানুষের গায়ের গন্ধের চেয়ে জোরালো। সেই গন্ধের আড়ালে আমি গায়েব। আমার গন্ধ তারা পায় না। চৌকির উপরেই যে আমি তা তারা টের পায় না।

তাদের মধ্যে যারা ভাস্কো-ডি-গামা কি কলম্বাস গোছের, তারা হয়তো চৌকির তলার থেকে বেরোয়—আমার আবিষ্কার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফিনাইলের বেড়া অবধি এসে ঠেকে যায় নির্ঘাত, এগুতে পারে না আর। তাদের নাকে লাগে, তারপর আরও এগুলে পায়ে লাগে, ফিনাইলের কাদায় তাদের পা এঁটে বসে যায়, চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত চটচটে কম্বলের সঙ্গে তাদের চটাচটি হয়ে যায় নিশ্চয়। বিশ্বসংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ তিতবিরক্ত হয়ে তারা ঐখানেই জবড়জং হয়ে পড়ে থাকে।

বছরের পর বছর আমার রক্ত না খেয়ে কী করে যে তারা বেঁচে আছে তাই আমার কাছে এক বিস্ময়। সেই রহস্যের আমি কিনারা পাইনি এখনও। যাকে উপোসী ছারপোকা বলে, আমার মনে হয়, সেই রকম কিছু একটা হয়ে রয়েছে তারা।

তা থাক, তারা সুখে থাক, বেঁচে থাক। তাদের আমি ভালোবাসি। তারাই আমাকে একবার যা বাঁচিয়ে দিয়েছিল—

সকালে সবে ক্ষুর নিয়ে বসেছি, আমার বন্ধু বন্তিনাথ হন্তদন্ত হয়ে হাজির!

'পালাও পালাও, করছ কী।' বলতে বলতে আসে।

'পালাব কেন? দাড়ি কামাচ্ছি যে।'

'আরে হরেকেষ্টদা আসছে। এসে উঠবে এখানে—এই তোমার বাসায়।' সে জানায়, 'এখানেই আস্তানা গাড়বে।'

'সস্তা না।' দাড়ি কামাতে কামাতে বলি, 'সস্তা নয় অত।'

'গতবারে যখন কলকাতায় এসেছিল, উঠেছিল আমার ওখানে।

যাবার সময় বলে গেছে 'আবার এলে তোর বাসাতেই উঠব, আর তোকে যদি বাসায় না পাই তো উঠব গিয়ে শিবুর কাছে'……। বলে সে একটু দম নেয়। তারপরে ইঞ্জিনের মতো হাঁক ছাড়ে একখানা।

'আজ সকালে আমার এক টি-টি-আই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম শেয়ালদায়। ইষ্টিশানের প্লাটফর্মে পা দিয়েছি, দেখি কিনা, হরেকেষ্টদা ব্যাগ হাতে নামছে ট্রেন থেকে।'

'বটে?'

'দেখেই আমি পালিয়ে এসেছি……'

'যাতে হরেকেষ্টদা বাসায় গিয়ে তোমায় না পায়?'

'হ্যাঁ। চলে এলাম তোমার কাছেই। দিতে এলাম খবরটা। আমাকে যদি না পায় তো সটান তোমার এখানেই সে……।'

'আরে, আমার এখানে উঠবে কেন সে?' আমি তাকে আশ্বস্ত করি' 'একখানা মাত্র ছোট্ট চৌকি আমার, দেখছ তো, এর মধ্যে আমার সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করতে যাবে কেন? তার কিসের অভাব? ছুশো বিঘে তার ধানের জমি, দশটা আমবাগান, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা— সে কলকাতার যে-কোনো নামকরা ভালো হোটেলে উঠতে পারে।'

'এক নম্বরের কঞ্জুস। গতবারে আমার মেসে উঠেছিল, গেস্টচার্জ দিয়ে ফতুর হয়ে গেছি। তিনটি মাস নড়বার নামটি ছিল না। যাবার সময় সর্বস্বান্ত করে গেল আমায়।'

'কী রকম?'

'আমার শখের জিনিসগুলি নিয়ে গেল সব। ড্রেসিং টেবিলটা নিল, ডেক চেয়ারটাও; ব্র্যাকেট, তার ওপরে অ্যালার্ম টাইমপিস্‌টা অবধি। বললে খাসা হবে, এসব জিনিস পাড়াগাঁয়ের লোক চোখে দেখেনি এখনো! শেষটায় আমার টুথব্রাশটা ধরে টানাটানি।'

'সে কী! একজনের বুরুশ কি আরেকজন ব্যাভার করে নাকি?'

বললে, জুতোয় কালি দেওয়া যাবে এই দিয়ে। এমন কি, আলমারিটা ধরেও টানছিল বইপত্র-সমেত। কিন্তু বড্ড ভারী বলে পেরে উঠল না। বলেছে পরের খেপে এসে মুটের সাহায্যে নিয়ে যাবে……'

'মোটের ওপর আলমারিটা তোমার বেঁচে গেছে। মুটের ওপর চাপে নি।'

'আমি পালাই। এখুনি হরেকেষ্টদা ব্যাগ হাতে এসে পড়বে হয়তো।' সে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

'বাড়ি যাবে এক্ষুনি? বোসো, চা খাও।'

'বাড়ি? আজ সারাদিন নয়। খুব গভীর রাত্রে ফিরব বাসায় আমি ভাই এখন যাই।'

'হরেকেষ্টদার ভয়ে বাসাতেই ফিরবে না আজ? সারাদিন থাকবে কোথায় শুনি?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট কেষ্ট কেষ্ট হরে হরে—করে ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায়।' বলে সে আর দাঁড়ায় না।

দাড়ি কামিয়ে মুখ ধুতে-না-ধুতে হরেকেষ্টদা হাজির।

'আসুন আসুন হরেকেষ্টদা! আস্তাজ্ঞে হোক।' আমি অভ্যর্থনা করি, 'আমার কী ভাগ্যি যে আজ আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।'

'বষ্ঠিনাথকে বাসায় পেলাম না, তাই তোর কাছেই চলে এলাম। ব্যাগ নামিয়ে তিনি বললেন।'

'আসবেন বইকি। হাজারবার আসবেন। আপনি হলেন হরেকেষ্টদা আমাদের গাঁয়ের মাথা। আমরা কি আপনার পর?'

'তা নয়। তবে বষ্ঠিনাথ ছেলেটি ভালো। তার ওখানেই উঠি। আমাকে পেলে সে ভারী খুশী হয়।'

'আমিই কি অখুশী? বসুন, চা খান। চা আনাই, জিলিপি শিঙাড়া কচুরি—কী খাবেন বলুন।'

'যা ইচ্ছে আন। চা-টা খেয়ে চান করে দুটি ভাত খেয়ে বেরুব একটু। কলকাতায় এসেছি, এবার তোর এখানেই থাকব ভাবছি। বষ্ঠিনাথকে পেলুম না যখন······'

'তা, থাকুন না যদ্দিন খুশি। দাঁড়ান, চা-টা আনাই, পোর্টম্যানটো খুলে পয়সা বার করি। ওমা, এ কী, বাক্সর চাবি কোথায়? খুঁজে পাচ্ছি না তো। চাবিটা ফেললুম কোথায়! ভাঙতে হবে দেখছি

বাক্সটা। চাবিওলা কোথায় পাই এখন? ভাঙতে হবে দেখছি।'

'না না, ভাঙবি কেন বাক্সটা? দুবেলা চাবিওলা হেঁকে যায় রাস্তায়। চাবি করিয়ে নিলেই হবে। বেশ পোর্টম্যানটোটি তোর। ভাঙবি কেন? আমায় দিয়ে দিস্ বরং। দেশে নিয়ে যাব।'

শুনে আমি হাঁ হয়ে যাই। নিজের চাবি নিজেই সরিয়ে ভালো করলাম কিনা খতিয়ে দেখি।

'এখন ক টাকার দরকার তোর বল না? দিচ্ছি না-হয়।'

'গোটা পাঁচেক দাও তাহলে।'

'পাঁচ টাকা?' ব্যাগ খুলে তিনি বলেন, 'পাঁচ টাকা তো নেই রে, দশ টাকার নোট আছে।'

'তাই দাও তাহলে। পরে বাক্স খুলে দেব'খন তোমায়।'

হরেকেষ্টদার পয়সায় চা কচুরি শিঙাড়া জিলিপি জিবেগজা রাজভোগ দরবেশ বসানো যায় বেশ মজা করে।

দুপুরের আহার সেরে হরেকেষ্টদা বললেন, 'যাই, এবার একটু বদ্যিনাথের বাসা থেকে ঘুরে আসি। সে আমাকে একটা আলমারি দেবে বলেছিল। আধুনিক ডিজাইনের আলমারিটা। দেখতে খাসা। তার ওপরে রবিঠাকুরের বই ঠাসা। আমাকে উপহার দিতে চেয়েছিল বদ্যিনাথ। মুটের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে আসি গে।'

সেই যে বেরিয়ে গেলেন হরেকেষ্টদা, ফিরলেন সেই রাত দশটায়।

হায় হায় করতে করতে এলেন,—কোথায় গেছে বদ্যিনাথটা, সারাদিন দেখা নেই। বাসার লোক বলল সকালে বেরিয়েছে, কিন্তু এই রাত সাড়ে-দশটা অবধি অপেক্ষা করে···করে···করে'

'এতক্ষণ বদ্যিনাথের বাসাতেই ছিলেন তাহলে?'

'না, বাসায় থাকব কোথায়? ওর ঘরে তো চাবি বন্ধ। কার ঘরে থাকতে দেবে? বাসার সামনের একটা চায়ের দোকানে বসে বসে এতক্ষণ কাটালাম।···'

'সেই দুপুরবেলার থেকে এতক্ষণ!'

'শুধু শুধু কি বসতে দেয়? বসে বসে চা খেতে হল। তিনশো

কাপ চা খেয়েছি। এনতার খেলাম। খান পঞ্চাশেক টোস্ট। আড়াই ডজন অমলেট সব বক্তিনাথের অ্যাকাউন্টে। খেয়েছি আর নজর রেখেছি বাসার দরজায়, কখন সে ফেরে। কিন্তু নাঃ, এতক্ষণেও ফিরল না···'

'তাহলে আর কী করবেন। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন এবার।'

'না। কিছু খাব না। যা খেয়েছি তাতেই অম্বল হয়ে গেছে। তিনশো কাপ চা···বাপ্···জীবনে কখনো খাই নি।···না, কিছু আর খাব না। শুয়ে পড়ব সটান। মেজেয় আমার বিছানা করে দে। আছে তোর বাড়তি বিছানা? আমি তো বেডিং-ফেডিং কিছু আনি নি। বক্তিনাথের বাসায় উঠব ঠিক ছিল। এই মেজেয়···এইখেনেয়··· মাদুর-টাদুর যা হোক কিছু পেতে দে না হয়।'

'তুমি মেজেয় শোবে? তুমি বলছ কী হরেকেষ্টদা? অমন কথা মুখে এনো না, পাপ হবে আমার। তুমি আমার চৌকিতেই শোবে। আমি ঐ কম্বলটা বিছিয়ে শোব'খন মেজেয়···'

বলে আমি ফিনাইল-লাঞ্ছিত কম্বলটা বিছানার থেকে তুলে নিয়ে মাটিতে বিছোই। আর চৌকিতে তোশকের ওপর ধবধবে চাদর পেড়ে হরেকেষ্টদার জন্যে পরিপাটি বিছানা করে দিই।

হরেকেষ্টদা শুয়ে পড়েন। আমিও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ি। শুতে না-শুতে হরেকেষ্টদার নাক ডাকতে থাকে।

রাত বোধ হয় বারোটা হবে তখন, দারুণ একটা চটপটে আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

কী ব্যাপার? হরেকেষ্টদার নাক আর ডাকছে না! খালি মাঝে মাঝে চটাস্ চট্ চটাস্ চট্···চটাপট চটাপট চটাপট চটাপট··· শুনতে পাচ্ছি কেবল।

'ওরে, ওরে শিবু! আলোটা জ্বাল্ তো।'

আলো জ্বালা যাবে না হরেকেষ্টদা। এগারোটার পর মেন সুইচ অফ করে দেয়।'

'কী কামড়াচ্ছে রে? ভয়ঙ্কর কামড়াচ্ছে। দেশলাই আছে তোর?'

'দেশলাই কোথায় পাব দাদা? আমি কি সিগ্রেট খাই?'

'তাহলে মোমবাতি?'

'বাজারে।'

'কী সর্বনাশ! টর্চ আছে? টর্চ?'

'রাত দুপুরে কেন এই টর্চার করছেন হরেকেষ্টদা? চুপচাপ ঘুমোন!'

'ঘুমোব কী রে? জ্বালিয়ে খাচ্ছে যে! বাঁ পাশটা যে জ্বলে গেল রে···বাঁ পাশে শুয়েছিলাম···পা থেকে ঘাড় পর্যন্ত জ্বলছে।···'

'পাশ ফিরে শোন।'

'পাশ ফিরে শোব কী রে? শুতে কি দিচ্ছে? উঠে বসেছি! বসতেও দিচ্ছে না। ভীষণ কামড়াচ্ছে। কী কামড়াচ্ছে রে?

'কে জানে!' আমি নিস্পৃহ কণ্ঠে বলি: কী আবার কামড়াবে?'



'এ তো দেখছি খুন করে ফেলবে আমায়। একদম তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। কী পুষেছিস তুই, তুই জানিস। ছারপোকা নয় তো রে?'

'ছারপোকা? অসম্ভব। আমি অ্যাদ্দিন ধরে শুচ্ছি, আমি কি তাহলে আর টের পেতুম না।'

'তুই একটা কুম্ভকর্ণ। নাঃ বিছানায় কাজ নেই আমার। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই।

তিনি বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকলেন ঠায়।

সকালে আমরা উঠে দেখি···আমি উঠে দেখলাম, তিনি তো আগের থেকেই উঠেছিলেন, তিনি শুধু দেখলেন কেবল—চৌকির ওপর হাজার হাজার মৃতদেহ। ছারপোকার। হরেকেষ্টদার চাপে আর চটাপট চাপড়ে ছারপোকাদের ধ্বংসাবশেষ।

'ইস, তুই এখানে থাকিস কী করে রে? এই বিছানায় ঘুমোস কী করে? তুই একটা রাসকেল। রাবিশ—কুম্ভকর্ণ। নাঃ, আর আমি এখানে নেই। মা কালীর দিব্যি, আর কখনো এখানে আসছি না বাবা! আমার নাকে খত। বষ্ঠিনাথের বাসাতেই আমি থাকব! সেখানেই চললাম। সকাল সকাল গিয়ে পাকড়াই তাকে।' বলেই তিনি আর দাঁড়ালেন না। ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লেন, তাঁর ধার দেওয়া দশ টাকার উদ্ধারের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে।

পাকামি

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন চিংড়িহাটা দিয়ে হাঁটছিলেন।

'আমার পক্ষে এটা যেমন চিংড়িহাটা তেমনি আবার চ্যাংড়াহাটাও।' বললেন হঠাৎ হর্ষবর্ধন।

"তার মানে?" গোবর্ধন জিগ্যেস করে।

তুই একটা চ্যাংড়া তো। তোর মতন চ্যাংড়ার সঙ্গে হাঁটা মানেই চ্যাংড়াহাটা—তা ছাড়া আর কি।'

গোবর্ধন দাদার কথার সমুচিত জবাব দিতে চায়, কিন্তু কোনো কথা খুঁজে পায় না। চুপ করে থাকে।

'তোমার টেরিটি এবার বাগিয়ে নাও গো দাদা!' খানিক বাদে সে বলে ওঠে।

'কেন বল্ তো।'

'খদ্দের পাবে!'

'কিসের খদ্দের?'

'আমরা এবার টেরিটি বাজারে এলাম কিনা!' গোবর্ধন প্রাঞ্জল করে: তোমার টেরির খদ্দের পাবে এবার।

এতক্ষণে উপযুক্ত একটা উত্তর দিতে পেরে সে মনে মনে পুলকিত হয়। দাদা কিন্তু কথাটা গায়ে মাখেন না। বলেন, 'পাখিস্তানটা কোথায় খুঁজে বার কর্ তো দেখি!'

'ম্যাপ দাও, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'ম্যাপ কিসের?'

'ভারতবর্ষের। ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব—দুই সীমান্তে পাকিস্তান অবস্থিত।'

'দুত্তোর অবস্থিত!' দাদা ভারি বিরক্ত হন, 'আরে, আমি কি সেই পাকিস্তানের কথা বলছি নাকি? টেরিটি বাজার হচ্ছে পাখির বাজার। সেটা কোনখানে দ্যাখ না। ভালো মতন একটা পাখি কিনে নিয়ে বাড়ি যাব আজ।'

'বা-বা-বা!' পাখির কথায় গোবরা লাফিয়ে ওঠে: 'আমি পাখি ভারি ভালোবাসি দাদা! আমাকে একটা তোতাপাখি কিনে দিয়ো, তাকে আমি পড়াব।

'ত্থাখ তাহলে কোথায় পাখির দোকানটা।'

দেখতে আর হল না: শোনা গেল দেখতে না দেখতেই। খানিক বাদেই পাখিদের কিচির-মিচির কানে এল ওদের। সেই পাখোয়াজি গলার অনুসরণে একটু না যেতেই পাখির বাজার দেখা দিল। খাঁচায় খাঁচায় পাখির জটলা। পাখিদের হল্লা।

'আমাদের একটা তোতাপাখি দাও তো।' এক দোকানীকে গিয়ে দাদা বললেন।

'কি রকম তোতা? শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, না উচ্চশিক্ষিত?' জানতে চাইল পাখিওয়ালা।

'পাখি আবার উচ্চশিক্ষিত কি রকম?' কৌতুহল হয় হর্ষবর্ধনের!

'বাংলা জানে, হিন্দী জানে, উর্দু জানে, তামিল জানে ··'

'উড়ে? গোবর্ধন জানতে চায়।

'কী যা-তা বকচিস!' বাধা দেন দাদা: পাখি আবার উড়ে না তো কি! ছেড়ে দিলেই তো উড়ে যাবে।'

'না না, আমি বলছিলাম উড়িয়াদের ভাষা···'

'হ্যাঁ, তাও জানে।' জানালো দোকানী: এক একটা আবার ইংরিজিও জানে বেশ।'

'বলো কি হে!' হর্ষবর্ধন তো হতবাক্—'ভালোরকম জানে নাকি? বটে? ম্যাট্রিক পাশকরা পাখি?'

'না। ইংরিজি পড়তে পারবে না। তবে বলতে-কইতে পারে।'

'না। সেই রকম সাহেব পাখি আমাদের দিয়ো না।' গোবর্ধন আপত্তি জানায়: 'সাহেবদের গ্যাট-ম্যাট আমরা বুঝতে পারব না।'

'হ্যাঁ, আমরা সাদাসিধে মানুষ, আমাদের আটপৌরে বাঙালী পাখি দেবে।' দাদারও সায় ভায়ের কথায়। শুধু ভায়ের কথাই নয়, তাঁর পক্ষেও সেটা ভয়ের কথা।

'তাহলে একটু দাঁড়ান বাবু, এক্ষুনি আমাদের পাখির ডাক হবে। আর সব খদ্দের এসে পড়বে এক্ষুনি। তারা এলেই ডাক শুরু হবে। ঐ যে তোতাটা দেখছেন, দাঁড়ে বসানো, ওটা বাংলানবীশ। ওটাকেই না হয় সবার আগে নিলামে চড়াবো।'

খানিক বাদেই জনকয়েক খদ্দের জুটলো। ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলো পাখিদের। কেউ ময়না, কেউ টিয়া, কেউ শালিক, কেউ আবার সেই তোতাটাকেই পছন্দ করল। ডাক শুরু হল পাখিগুলোর! কয়েকটা শালিক ময়না এক ডাকে বেরিয়ে গেল। তারপর তোতাপাখিটা উঠলো নিলামে।

'পাঁচ টাকা।' হাঁক দিল দোকানী।

'সাড়ে পাঁচ।' ডাকলো একজন খদ্দের।

'দশ টাকা।' গোবর্ধনের ডাক।

'বিশ টাকা।' হর্ষবর্ধন হাঁকলেন।

'বারে! আমিই তো ডাকছি। তুমি আবার আমার ওপর ডাকছো কেন?' দাদার কাণ্ডে গোবরা তো অবাক্‌ঃ 'দর বাড়াচ্ছো মাঝ থেকে? আমি কিনলে কি তোমার কেনা হবে না?'

'ও, তুই ডাকছিস বুঝি!' দাদা একটু অপ্রতিভ হন।

'পঁচিশ টাকা!' গোবর্ধন ডাকলো তখন।

'তুই আবার আমার ওপর ডাকলি যে! তুই আর আমি কি পৃথক?' হর্ষবর্ধন লুব্ধ হনঃ 'তুই যদি এমন করিস তাহলে আমিও ফের তোর ওপরে ডাকবো আবার। তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।'

'না না, আর এমনটা হবে না আমি কথা দিচ্ছি···' গোবর্ধন বলতে যায়, এমন সময়ে আবার ডাক ওঠে—'তিরিশ টাকা।'

'কে ডাকলো আবার?' হর্ষবর্ধন বলেন।

'আমি ডাকিনি···' গেবর্ধন বলেঃ 'আমার ডাক চল্লিশ।'

'পঞ্চাশ।'

'আবার তুমি ডাকছো দাদা?'

'কই, আমি তো ডাকিনি! কে ডাকলো তবে?' বলে তিনি

হাঁক পাড়েন : 'সত্তর। আমি ডাকছি সত্তর।'

'বাহাত্তর।' মিহি গলায় শোনা যায়।

'নিরানব্বই।' হর্ষবর্ধন ডাক ছাড়েন।

'একশো আট।' কে ডাকে কে জানে।

'তিনশো ছাব্বিশ।' হর্ষবর্ধনের রাগ চড়ে, ডাক চড়ে।

'পাঁচশো' গোবর্ধনের ডাক নয়।

'সাতশো। আবার কার ডাক।

'দু হাজার।' হর্ষবর্ধনের হাঁক শোনা যায়।

'বাস্, আর নয়।' দোকানদার মাঝে পড়ে বলেন : 'দু হাজার এক···দু হাজার দুই···বাস্। খতম্। দিন দু হাজার টাকা।'

কুড়িখানা একশো টাকার নোট গুণে দিয়ে পাখি নিয়ে দু' ভাই রওনা দেন। কিছুদূর এসে দাদার খটকা লাগে—'আরে, এতগুলো টাকা দিয়ে কিনলাম পাখিটা। কিন্তু পাখিটাকে তো বাজিয়ে নেওয়া হয়নি। এখন কথা বলতে জানে কিনা এটা কে জানে!'

'উজবুক!'

'তুই আমাকে উজবুক বললি?' হর্ষবর্ধন ভারি খাপ্পা হন : 'উজবুক না উল্লুক কী বললি তুই! ছোট ভাই হয়ে কিনা দাদাকে উল্লুক বলে!'

'আমি কোথায় বললাম! বা রে!' গোবরা প্রতিবাদ করে।

'উজবুক কোথাকার!' পাখিটার গলা থেকে আসছে কথাটা, স্পষ্টই শোনা যায়।

'আরে, পাখিটা গাল পাড়ছে যে!'

'অবাক্ কাণ্ড!' গোবরা গালে হাত দেয়।

'আমি যদি কথা কইতে জানি না তবে এতক্ষণ কে কথা কইছিল তোমাদের সঙ্গে?' তোতাপাখিটা বকে।

'তার মানে?'

'নিলাম ডাকছিল কে? নিলামের ডাক বাড়াচ্ছিল কে এতক্ষণ?'

'মানে, তুমিই ডাক বাড়াচ্ছিলে? বটে।' দুই ভাই বিস্ময় মানেন।

'চ ফিরে সেই পাখিওয়ালার আড়তে।' হর্ষবর্ধন বলেন: 'যে পাখিটাকে এমন করে পড়াতে পারে সে না জানি...'

দু' ভায়ে আবার ফিরে আসেন টেরিটিবাজারে।

'হ্যাঁ গা, তোমরা সামান্য পাখিটাকে শিক্ষিত এমন করলে কি করে?'

'আলমবাজারে তে আমাদের পশুপক্ষীর ইস্‌কুল আছে বাবু।' ব্যক্ত করে আড়তদার: 'সেখানে আমরা জীবজন্তুদের শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করি।'

'বেশ ভাল কথা। আমি বলছিলাম কি, তোমরা যখন জীবজন্তুদের শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করো, তখন আমার এই ভাইটিকেও যদি...'

'আপনার ভাইকে!'

হ্যাঁ, আমার ভাইও একটা জন্তু তো!...জন্তু ছাড়া কিছু নয়।'

'আমি জন্তু।' গোবর্ধন ফোঁস করে ওঠে।

'তা জন্তু ঠিক না হলেও জানোয়ার তো বটেই! এমন জান বার করে দেয় আমার এ:কেক সময়। মানুষ হল না ছোঁড়াটা। একে আমি তোমাদের ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে চাই।'

'খাঁটি জানোয়ার নিয়ে আমাদের কারবার মশাই! সেখানে এসব ভ্যাজাল চলে না আসল জীবজন্তু নিয়ে আসুন, মানুষ করে ছেড়ে দেব।'

'আপনারা কী শেখান? শুনি?'

'ইংরেজি, বাংলা, হিন্দী, অঙ্ক, জিমন্যাস্টিক, ড্রিল, প্যারেড' সব। সার্কাসের বাঘ ভাল্লুক-সিংহ-হাতী—এদের শেখায় কারা? আমরাই তো।'

'আচ্ছা, সেই ভালো।' হর্ষবর্ধন বলেন তখন: 'গোবরাটার যখন ইচ্ছে নয়, মানুষ হতে চাইছে না যখন, আর আপনারাও যখন নারাজ, তখন ওর বদলে ওর কুকুরটাকেই ভর্তি করব আপনাদের ইস্কুলে। দেখা যাক্ সেটা যদি আপনাদের কৃপায় শিক্ষিত হয়। তারপর তার দেখাদেখি আমার ভাইও যদি...'তার বেশি আর

তিনি ব্যক্ত করেন না। 'এগজাম্পল ইজ বেটার দ্যান অ্যাডভাইস।' এই বলে শেষটা করেন।

শেষটা গোবর্ধনের বুলডগটাকেই আলমবাজারের পশুপক্ষীর পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হল। রীতিমতন আবাসিক বিদ্যালয়। পশুপক্ষীরা হোস্‌টেলে থাকে, ইস্কুলে পড়ে। গরমের আর পূজোর ছুটিতে বাড়ি আসে। সব ইস্কুলের যেমন রেওয়াজ।

গরমের ছুটিতে বাড়ি ফিরল বুলডগ। দুই ভাই তাকে নিয়ে পড়লেন—কদ্দুর শিখেছে দেখা যাক।

'অঙ্ক পারিস—অঙ্ক? দুই আর দুয়ে কত হয়?

'ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্।' কুকুরটা পা ঠুকে জানালো—চার।

বাঃ অঙ্কটা তো বেশ শিখেছে দেখছি! নামতা জানিস, নামতা? ষোলো ষোলো কতো হয় বলতে পারিস?' গোবর্ধন শুধোয়।

কুকুরটা পা নাড়ে না, চুপ করে থাকে।

'একেবারে ষোলো ষোলোং?' হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন: 'কেউ তা পারে? তুই পারিস বলতে—ষোলো ষোলো? আমি পারি? কেউ পারে, যে ও পারবে?'

'আচ্ছা থাক। জিমন্যাস্টিক শিখেছিস্? ড্রিল? প্যারেড? লেফট···রাইট···লেফট···রাইট···'

কুকুরটা লেজ নাড়ে কেবল।

'ওই তো শিখেছে। লেজের ড্রিলটাই শিখেছে দেখছি। ডাইনে বাঁয়ে নাড়ছে তো। বেশ নাড়ছে। ক্রমে ক্রমে শিখবে সব। ক'দিন আর পড়েছে বল্।'

'সমস্‌কৃত শিখেচিস? গোবর্ধন শুধায়।

কুকুর চুপ!

'হাঁ কি না বল্। শিখেচিস সমস্কৃত?'

কুকুর নিরুত্তর।

'ওমা! মাঝখান থেকে এযে দেখছি তামিলটাও ভুলে গেল আবার?'

'কিসের তামিল?' জানতে চান দাদা।

'হুকুম তামিল।' বলল গোবর্ধন : কথার কোনো জবাবই দিচ্ছে না দেখছ!

'কি করে শিখবে সমস্‌কৃত ? কুকুররা কি অনুস্বর উচ্চারণ করতে পারে ? অং বং বলতে পারবে কুকুর ? তোর যত বাড়াবাড়ি!'

'তাহলে জাতীয় ভাষা ? হিন্দী ?' গোবরার জিজ্ঞাসা।

কুকুরটা চুপ।

বিজাতীয় ভাষা ? তাও কিছু শিখিসনি ? ইংরিজি, ফরাসী গ্রীক, লাটিন···?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু।

'ম্যাও!' কুকুরটা মুখ খোলে এবার।···

'হাড়ে হাড়ে শিক্ষা পেয়েছে দেখছি।' তোতাপাখিটা দাঁড়ে বসে পাকামি করে। ফোড়ন কাটে।

'মিউ! করুণ সুরে কুকুরটা সাড়া দেয়।

———

ম্যাও ধরা কি সহজ নাকি?

ঘুম দিয়ে আমি মহাত্মা কুম্ভকর্ণকে হারাতে পারি না তা ঠিক, তিনি এক ঘুমে ছ-মাস কাটিয়ে দিতেন। তা হলেও আমি প্রায় তাঁর কাছাকাছিই যাই। এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে যায় আমার।

ডাকাত পড়লেও আমার নাক ডাকার ব্যাঘাত ঘটে না নাকি। অমন কি দেখেছি, মানে, আমি পরদিন সকালে উঠে দেখেছি যে আমার ঘুমের ওপর দিয়ে ভূমিকম্প চলে গেছে তথাপি আমার ঘুম ভাঙেনি। আশেপাশের বাড়িঘর সব ভেঙে পড়েছে, পাড়ার সবাই দারুণ সোরগোল তুলেছিল, কিন্তু ঘুম আমার টস্‌কাতে পারেনি। এমন যে ঘুম আমার তাও সেদিন মাঝরাতে ভেঙে গেল আচমকা। ধড়মড় করে উঠে বসলাম বিছানায়।

ব্রাম্‌বাবু···ব্রাম্‌বাবু···ব্রাম্‌বাবু···একটানা একটা আর্তনাদ ধাক্কা মারছিল সদর দরজায়। ভেঙে ফেলেছিল যেন দরজাটা।

ব্রাম্‌বাবু? ব্রাম্‌বাবু আবার কে রে বাবা? ওই নামওয়ালা তো কেউ থাকে না এই বাসায়। তবে এই ঘুম-ভাঙানো ধুমধাড়াক্কা কিসের জন্যে?

চোখ মুছতে মুছতে নেমে দরজা খুলে দেখি শ্রীমান গোবর্ধন চন্দর।

'গোবরা ভায়া যে? এই রাত দুপুরে? ডাকাত পড়ার মতন ডাক ছাড়ছিলে যে? হয়েছে কী?'

'ঘুম বটে আপনার একখানা। আমার বৌদির ঘুমকেও টেক্কা মারে···বাবা! কম ডাক ছাড়ছি, কম হাঁক পাড়ছি আমি তখন থেকে? আমার গলা ভেঙে গেল, আপনার ঘুম ভাঙার নামটি নেই।'

'তা তো হোলো। কিন্তু ব্রাম্ ব্রাম্ বলে ডাকছিলে কেন? আমি ব্রাম্ নাকি? আমি শিব্রাম্ না?' ঘুমভাঙার চাইতেও নামের ভগ্নদশায় আমার রাগ হয়ে যায়—'আমার শি গেল কোথায়? শি?'

'শি তো আপনার কখনো দেখিনি মশাই। বৌদিকে আর দেখলাম কোথায় ? আপনার হি-ই তো দেখছি বরাবর।' বলে সে হি হি করে হাসে : 'অবশ্যি মাঝে মাঝে এখানে এসে ইতুদি বিনিদিকে দেখছি বটে, কিন্তু তাঁরা তো আপনার শি নন্। বোনই তো আপনার ব্রাম্‌বাবু।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আবার ওকে এই ব্রাম্ বলতে শুনে ইচ্ছে করে ওর মুখের ওপরে দরজাটা ড্রাম্ করে বন্ধ করে দিই। কিন্তু সামলে নিয়ে বলি—

'তা তো হোলো! কিন্তু ব্যাপারটা কী ?'

'দাদা আসতে বলল আপনার কাছে···ছুটতে ছুটতে এসেছি।'

'কারণ।'

'কারণ, বৌদি হ্যাঁ করে ঘুমোচ্ছিল তো, একটা নেংটি ইঁদুর সেই ফাঁকে না বৌদির মুখের মধ্যে গিয়ে সেঁধিয়েছে···'

'অ্যাঁ। কী সর্বনাশ। আমি আঁতকে উঠি। গলায় আটকে গেছে বুঝি ইঁদুরটা ? তারপর তাকে লেজ ধরে টেনে বার করা হয়েছে তো ?'

'লেজ টেজ কিচ্ছু বেরিয়ে নেই, কী করে টানব ? গোবরা বলে : আটকায়নি তো গলায়।'

'গলায় আটকায়নি ? যাক্, বাঁচা আমি হাঁফ ছাড়ি।

'গলায় আটকায়নি, গলার তলায় চলে গেছে সটান।' গোবর্ধন জানায় : 'পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে একেবারে।'

'ও বাবা !···তা, তোমার বৌদি কি করছেন এখন।

'কিচ্ছু না॥ তেমনি ঘুমোচ্ছেন অকাতরে। পেটের ভেতরে যে ইঁদুর ঢুকেছে তা টেরও পাননি বোধ হয়। যা ঘুম বাবা বৌদির।'

হ্যাঁ, ঘুম বটে একখানা!' মানতে হয় আমায় : 'একেই যথার্থ ঘুম বলে। আমার ঘুমকেও টেক্কা দেয় বটে। এরই নাম বোধ হয় সুষুপ্তি।

'সুষুপ্তি কি হুষুপ্তি জানিনে, দাদা মাথায় হাত দিয়ে বসে

পড়েছেন। এই রাত ত্বপুরে কি রাম ডাক্তারকে পাওয়া যাবে? আসবেন রাম ডাক্তার? চারগুণ ভিজিট দিলেও আসবেন কি?' গোবর্ধন শুধায়।

'আসতে পারেন হয়ত। চেষ্টা করে দেখতে হয়।'

'তাই দাদা পাঠালেন আপনার কাছে। আপনি যদি চেষ্টা-চরিত্র করে কোনো রকমে···'

'চলো দেখা যাক।'

রাম ডাক্তারের বাড়ির সামনে গিয়ে খাড়া হলাম আমরা। গোবরাকে বললাম—'সেই রকম একখানা ছাড়ো এইবার, আমার দরজায় যা ছেড়েছিলে। রামবাবুর ঘুম কতটা প্রগাঢ় আমার জানা নেই তো।'

'কী ছাড়ব বলছেন?'

'রাম ডাক! কিংবা দরজার উপর করাঘাত। কিংবা দরজাটার কড়ানাড়া—যা খুশি। বেশ কড়া রকমের একখানা ছাড়তে হবে।'

দরজার উপর কোনো কড়াকড়ি না করে বাজপড়ার মত কড়াক্-কর আওয়াজ ছাড়ল গোবরা—'তারবাবু···তারবাবু···তারবাবু···'

বেয়াক্কার হয়ে গোবরা বেয়াড়া ডাক ছাড়তে লাগল।

আমি বাধা দিলাম—'ডাক ছাড়তে বলেছি বলে কি তুমি ডাক্তারের 'ডাক' ছাড় দিয়ে ডাকবে নাকি? তার তার বলে ডাকলে ডাক্তারবাবু রাগ করতে পারেন!'

'বাঃ, আপনি ডাক ছাড়তে বললেন না? তাই তো আমি ডাক ছেড়ে ছেড়ে···'অবাক হয়ে যায় সে আমার কথায়।

ডাক্তারদের ঘুম স্বভাবতই ক্ষণভঙ্গুর। সব সময়ে কলের অপেক্ষায় বিকল হয়ে থাকেন বলেই এমনটা হবে বোধ হয়। খানিক না ডাকতেই ডাক্তারবাবু মুখ বাড়ালেন দোতলার বারান্দার থেকে—'কে'?

'আজ্ঞে আমরা। কল দিতে এসেছি আপনাকে।' জানায় গোবরা।

'কী ব্যায়রাম। হাঁকলেন তিনি।

আমি যেন শুনলাম—কে ব্যায়রাম। 'আজ্ঞে কোনো ব্যায়রাম নয়। শিবরাম।' বললাম আমি তখন।

'শিবরাম তো বুঝলাম—রোগটা কী ?'

রোগটা কে ? এমনি যেন শুধোলেন আমার মনে হোলো।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।' ঘাড় নাড়লাম আমি—'রোগই বটে। তবে আর-ও-জি-ইউ-ই রোগ। ওর নাম গোবরা। তস্য ভ্রাতা।

'তস্য ভ্রাতা ? সে আবার কী ?'

'আগে হর্ষবর্ধনকে জানেন ? হর্ষবর্ধনবাবু ? তস্য ভ্রাতা, মানে তাঁর ভাই গোবর্ধন।'

'যাঃ। কিছু বুঝতে পারছি না। নামছি, দাঁড়াও।'

নেমে তিনি তাঁর চেম্বারের দরজা খুললেন। ভিতরে ঢুকলাম আমরা। গোবরা বিশদ করে করে তার বৌদির ব্যাপারটা বলল।

'তোমার বৌদি কী করছেন এখন ?'

'তেমনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন—হাঁ করে তেমনি।'

'হাঁ করে ঘুমোচ্ছেন ? তা হলে এক কাজ করো। তাঁর ঐ হাঁ করা মুখের সামনে ইঁদুর ধরা কল পেতে রাখো না কেন—ইঁদুরের খাবার দিয়ে কলটায়। খাবারের লোভে আপনি বেরিয়ে আসবে ইঁদুরটা।'

'তা তো আসবে, কিন্তু অ্যাতো রাত্তিরে এখন কল পাবো কোথায় ? ইঁদুর ধরা কল নেই তো আমাদের বাড়ি।'

'তা হলে এক কাজ করোগে। পাতে পড়ে থাকা রুটির টুকরো সুতোয় বেঁধে বৌদির হাঁয়ের সামনে নাড়তে থাকো, বুঝলে ? রুটির গন্ধ পেলেই—এছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি না বার করার। নিজগুণে যদি না বেরোয়…' বলে ডাক্তারবাবু নিজরূপে ব্যক্ত হলেন…'রাত্রে আমার কলের ফী চার ডবোল, ত জানো ?'

'জানি। তাই দেব আমরা।'

'বেশ। যাচ্ছি আমি একটু বাদেই ; তৈরী হতে আমার খানিক টাইম লাগবে। তুমি ততক্ষণ গিয়ে রুটির টুকরোটা নাড়তে থাকো নাকের গোড়ায়। নিশ্বাস-প্রশ্বাসে রুটির গন্ধ পেটে গেলেই গন্ধ পেলেই বেরিয়ে আসবে ইঁদুরটা। আমার যাবার আগেই হয়ত বা।'

'আমি নাড়ছি গিয়ে রুটির টুকরো। আপনি শিগগির আসবেন কিন্তু! আপনি না এলে দাদা ভরসা পাচ্ছেন না।' বলে গোবরা ছুটতে ছুটতে চলে যায়। বলে যায় আমায়, ডাক্তারবাবুকে সংগে করে নিয়ে যেতে।

ডাক্তারবাবু সহ গিয়ে দেখি হর্ষবর্ধন একটা বেশ বড় সড় তেলাপিয়া মাছ ধরে তার বৌয়ের মুখের ওপর নাড়ছেন। জলজ্যান্ত তেলাপিয়া।

তেলাপিয়াটা নড়ছিল। তার ওপরেও তাকে ধরে তিনি নাড়ছিলেন। আর তাঁর বৌ ঘুমিয়ে যচ্ছিলেন বেমালুম···

'এই রাত্রে আপনি জ্যান্ত তেলাপিয়া পেলেন কোত্থেকে মশাই? অবাক লাগে আমার—'বাজার হাট সব বন্ধ তো এখন।'

'তেলাপিয়া আমাদের চৌবাচ্চায় জীয়নো থাকে।' জানান তিনি ঃ আমার বৌ তেলাপিয়ার ভারী ভক্ত কিনা।'

'আমি রুটির টুকরো নাড়তে বললাম না?' ডাক্তারবাবু আবার আমার চেয়েও অবাক—'রুটির বদলে এই মাছ আমদানি হলো যে?' মাছের গন্ধে কি ইঁদুর বোরোয় নাকি?'

'আজ্ঞে, হয়েছে কি, শুনুন তাহলে।' বলতে শুরু করলেন হর্ষবর্ধন, 'আমার বৌ হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল তো! হাঁ করেই ঘুমোয় ও। ভারী বদভ্যাস। যাক গে, বৌয়ের মুখ বুজোয় সাধ্য কার? ঘুমোয় হাঁ করে আর জেগে থাকলে হাঁ হাঁ করে···'

'জানি জানি। বৌদের চিরকালের হাহাকার জানা আছে আমার।' বাধা দেন ডাক্তার, 'আমি বলেছিলাম···'

'শুনুন না।' বাধা দিয়ে বলে যান হর্ষবর্ধন ঃ ইঁদুররা গর্তের থেকে বেরোয় জানেন বোধ হয়? আর গর্তের ভেতরে গিয়ে সেঁধোয় তাও

নিশ্চয় আপনার জানা আছে…'

'কে না জানে !' আমার বাক্যব্যয়।

'এখন দেখছেন তো বৌয়ের আমার কতো বড়ো হাঁ। অমন ফাঁক পেলে কতো মশা মাছিই সেঁধিয়ে যায় তো ইঁদুর…।'

'আমি জানি। ফাঁক পেয়ে সেঁধিয়ে গেছে ইঁদুরটা জানা আছে আমার।' অধীর হয়ে ওঠেন রাম ডাক্তার।

'আর ইঁদুরটা সেঁধিয়ে যেতেই না আমি গোবরাকে পাঠিয়েছিলাম আপনাদের খবর দেবার জন্যে। কিন্তু সে চলে যাবার পরেই হয়েছে কি…' বলতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হন হর্ষবর্ধন: 'আমি কি জানি যে একটা বেড়াল ওদিকে ওৎ পেতে রয়েছে শিকার ধরবার জন্যে ? তাক করে ছিল সে ঐ নেংটি ইঁদুরটাকে ধরবার জন্যে, তাকে দেখতে পেয়েই সে তাড়া করেছে। আর ইঁদুররা ভয় পেলেই গর্তের মধ্যে গিয়ে সেঁধোয়। সামনে হাঁ করা আমার বৌকে পেয়েই নিজের গর্ত মনে করেই হয়ত বা…'

'সেঁধিয়ে গেছে। এসব জানা কথা। আসল কথায় আসুন।' রাম ডাক্তার ব্যয়রামের গোড়ায় যেতে চান।

'আর, তারপরেই ইঁদুরটাকে তাড়া করে বেড়ালটাও বৌয়ের পেটের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।'

অ্যাঁ। চমকে ওঠেন ডাক্তার: 'আস্ত একটা বেড়াল চলে গেল পেটের মধ্যে আর উনি টের পেলেন না আদৌ। ঘুম ভাঙলো না ওঁর ?'

'এমনি ওঁর ঘুম মশাই। হাতি চলে গেলেও টের পাবে কিনা কে জানে!'

'ল্যাজ ধরে টানলেন না কেন তখন বেড়ালটার ? তক্ষুনি তক্ষুনি।'

'গেছলাম টানতে, কিন্তু ল্যাজ ফ্যাজ কিছু বেরিয়ে নেই। সব সমেত চলে গেছে পেটের তলায়! গলার এদিকে বেরিয়ে নেই কিছু। তাই গোবরা যখন এসে রুটির টুকরো নাড়বার কথা বলল, আমি বললাম আর ইঁদুরের জন্যে ভেবে কী হবে, এখন বেড়ালটাকে বার

করার দরকার। যা, চৌবাচ্চার থেকে একটা তেলাপিয়া ধরে আন।'

খোদার ওপর খোদকারি করার মতন হর্ষবর্ধন ডাক্তারের ওপর ডাক্তারি করার ব্যাখ্যা দেন তাঁর—'তাই এই মাছটা ধরে মুখের কাছে নাড়ছি। আপনার প্রেসক্রপসনটাই একটু পালটে নিলাম··· বেড়ালটা বেরুলে সে ইঁদুরটাকে মুখে করেই বেরুবে ত।'

'রোগিনীর অবস্থা কেমন দেখি একবার।' রাম ডাক্তার তাঁর স্টেথিসকোপ বার করেন। এরকম রুগী এর আগে পাইনি। বিলকুল আনকোরা বিচ্ছিরি ব্যায়রাম।' মুখ বিকৃত করে তিনি বলেন।

কিন্তু স্টেথিস্‌কোপ তো বুকে বসাবার? কিন্তু তিনি সেখানে না বসিয়ে কলের চোঙটা মেয়েটির পেটেই বসান। অবাক লাগে আমার। এটা আবার কী ক্ষেনো? এ ধরনের খাপছাড়া চিকিৎসা কেন? নাকি, বেথাপ্‌পা রুগী পেয়ে খাপ্‌পা হয়ে গেলেন ডাক্তার।

অবশ্যি, হৃদয় কারো কারো বেশ উদার হয়ে থাকে আমি জানি, কিন্তু উদার তো কখনই হয় না। মাঝখানে, আ-কারের তারতম্য থেকেই যায়। তবে কি ইঁদুর বেড়ালের পাল্লায় পড়ে বিগড়ে গিয়ে ইতর বিশেষের জ্ঞান লোপ পেল ওর।

'যন্ত্রটা ওঁর পেটে বসাচ্ছেন যে।' কেমন বুঝছেন হার্টের অবস্থা?' বলে কথাটা ঘুরিয়ে ওঁর ভুলটা ধরিয়ে দিতে যাই।

'হার্ট দেখছি না বেড়ালটার। ম্যাও ট্যাও কিচ্ছু না।'

'ইঁদুরটার আওয়াজ পেলেন কোনো?' আমি জানতে চাই।

'ইঁদুর কি টু শব্দটি করতে পারে··বেড়ালের সামনে?' আমার প্রশ্নে গোবরা হতবাক হয়ঃ 'বেড়ালের মুখের ওপর মুখ নাড়ার ক্ষমতা আছে ওর?'

'তাছাড়া' সে কি আর পেটের মধ্যে আছে এতক্ষণ।' জবাব দেন ডাক্তারবাবু 'বেড়ালের পেটেই চলে গেছে। আমি তাই বেড়ালটার ম্যাও ধরবারই চেষ্টা করছিলাম স্টেথিসকোপ দিয়ে।'

'ম্যাও ধরা কি সহজ নাকি মশায়?' আমি বলি—তারপর

তো ধরে তার গলায় ঘন্টা বাঁধা ঢের পরের কথা।'

পৈটিক জাস্‌টিস্ করার পর ডাক্তার বাবু উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়ালেন নিজের ফীজের জন্য। 'ওঁকে ওমনি ঘুমোতে দিন এখন, ঘুম ভাঙাতে যাবেন না যেন কেউ।' বললেন তিনি।

'ক্ষেপেছেন।' এক ক্ষেপেই মেরে দেন হর্ষবর্ধন।

'কে ভাঙাবে ওঁর ঘুম?' বলতে গিয়ে শিউরে ওঠে গোবরা ঃ 'ঘুম ভাঙলে বৌদি কি রক্ষে রাখবে নাকি কারো।'

'না না ঘুমুন উনি যেমন ঘুমুচ্ছেন—ডিসটার্ব করবেন না ওঁকে।' ডাক্তার বাতলান 'রাতভোর ঘুমোন।'



বেড়ালটার কি গতি হবে? আমি জিজ্ঞেস করি। 'ওটা কি পেটেই থেকে যাবে নাকি ওঁর?'

মেয়েদের পেটে কেনো কথা থাকে না বলে না কি? কিন্তু বেড়াল তো চাট্টিখানি কথা না।' বলেন হর্ষবর্ধনবাবু, স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেন—'চারপেয়ে আস্ত একটা বেড়াল...'

'পেটের ভেতর গিয়ে নাচার হয়ে পড়েছে বেচারা। আমার ধারণা প্রকাশ করি, 'নাড়িভুঁড়ির গোলকধাঁধায় বেরুবার পথ পাচ্ছে না।'

পেটের মধ্যেই থাক। মেয়েদের পেটে কথা না থাকলেও এটা মনে হচ্ছে থেকেই যাবে শেষ পর্যন্ত। ভিজিটের টাকা পকেটে গুঁজতে গুঁজতে রাম ডাক্তার ফাঁস করেন—'মেয়েদের পেটের কথা হজম না হলেও বেড়ালটা মনে হচ্ছে হজম হয়ে যেতে পারে।'

'কোনো ওষুধ টষুধ দেবেন না?' হর্ষবর্ধন জিগ্যেস করেন।

'সেটা কাল সকালে উনি ঘুম থেকে উঠবার পর কেমন বোধ করেন সেটা জেনে তারপর।' ডাক্তারবাবু জানতে চান: 'কত ওজন হবে বেড়ালটার? আন্দাজ? সাত আট কেজি হতে পারে বলছেন? এই গুরু ভোজনের পর গরহজম হতে পারে হয়ত। যদি চোঁয়া ঢেকুর টেকুর ওঠে তো একটু হজমি দাবাই দিতে পারেন, নয় তো কড়া জোলাপ। সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থ্য তখন।'

ব্যবস্থাপত্র দেবার পর তিনি সযত্নে রোগিনীর মুখটা বুজিয়ে দেবার জন্য উন্মুখ হন। কিন্তু সহজে কি সেই হাঁ করে বুজবার? প্রায় ছোট ছেলের মতই অবুঝ। অনেক চেষ্টার পর তাঁর হাঁ কে না করানো যায়।

'মুখটা বুজিয়ে দিলেন যে?' জানার কৌতুহল হল আমায়।

'কী জানি, বেড়ালটার খোঁজে যদি কোন কুকুর এসে ঢুকে পড়ে আবার। এর ওপর কুকুর গিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকলে যে শিবের অসাধ্যি হয়ে যাবে। মুখের দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম তাই। ওই কুকুরের রাস্তা বন্ধ করতেই বুঝলেন মশাই?' মুগুরের মত মুখখানা ভারী করে রাম ডাক্তার বাড়ীর পথ ধরেন।

সহজ নয় খবরদারী

খবর দেয়া কি সহজ কথা? কথায় বলে, খবরদারি! খবরদার —কথাটার দুটো মানে, এক হচ্ছে যে খবর দেয়। আরেক হচ্ছে, সাবধান! তার মানে খবর দেবে খুব সাবধান হয়ে।

মানে কিনা, খবরা-খবর। খবরের সঙ্গে অখবর, সংবাদের সঙ্গে দুঃসংবাদ জড়ানো থাকে। সেইজন্য তা কায়দা করে ফাঁস করতে হয়। আসল কথাটা আস্তে আস্তে ভাঙাটাই হচ্ছে দস্তুর।

সিধুর মাসির কাছে কি করে খবরটা দেবে সারা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছে মানতু। মাসি নাকি ভারী কড়া মেয়ে, আর খবরটাও তেমন মিঠে নয়। এই মিঠে-কড়া সংবাদ কি করে যে মেটানো যায়। ভালো দায় নিয়েছে সে নিজের ঘাড়ে।

দরজায় কড়া নাড়তেই মাসি এসে হাজির।

'আপনি কি ক্যান্ত মাসি? জিগ্যেস করেছে মানতু।

'সিধু—আমাদের সিদ্ধেশ্বরের মাসি তো আপনি? সিধু আজ বাড়ি ফিরতে পারবে না।

'কেন কী হয়েছে?'

বাড়ি ফেরার তার শক্তি নেই। শনিবার আজ—শনিবার দুটোর সময় অফিসের ছুটি হয় জানেন তো? তার ওপর আজ আবার মাসকাবার। মাইনে পেয়ে যেই না সে ফুর্তির চোটে লাফ দিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে—পড়বি তো পর—একেবারে এক চলন্ত মোটরের সামনে—'

'চাপা পড়েছে নাকি?—অ্যাঁ! অ্যাঁৎকে ওঠেন মাসি।

'না, পড়েনি। মোটরটা তখন ব্যাক্ করছিল—তাই রক্ষে। মোড় ঘোরাচ্ছিল গাড়িটার। কিন্তু ঘুরিয়ে নিয়ে সামনে আসতেই দেখা গেল গাড়ির মধ্যে মুশ্কো মুশকো লোক। দুটি মিচকে শয়তান। সিধুকে দেখতে পেয়ে তারা নেমে এলো গাড়ি থেকে—

'সেই শয়তানের মত লোকদুটো?'

হ্যাঁ, যমদূতের মত চেহারা। সিধে চলে এল সিধুর কাছে…’

‘মেরে-ধরে সব কেড়ে-কুড়ে নিয়েছে তো?’

‘কাছে আসতেই সিধু চিনতে পারলো তাদের। পিণ্টু আর পট্‌লা। তাদের তাসের আড্‌ডার পিণ্টু আর পটল।’

‘পিণ্টু আর পটল তো আমার কী? ক্ষ্যান্ত মাসি জানতে চান।

লোকে পটল তোলে, কিন্তু পটলই সিধুকে তুললো। তুলে নিলো নিজের গাড়িতে। বললো চিনেবাজারে জুতো কিনতে যাচ্ছি, চ আমাদের সঙ্গে। বলে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেই না বোঁ করে রাস্তার মোড় ঘুরেছে—’

‘অমনি বুঝি একটা লরি?’

‘ঘুরতেই বেণ্টিংক স্ট্রীট। চীনে মুচিদের সারি সারি জুতোর দোকান। দোকানে ঢুকে জুতোর দর করতে গিয়ে দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল সিধুর। সিধু বললে, তোমার জুতো বিলকুল পিচবোর্ড! বলতেই ক্ষেপে গেল চীনেটা। একটুকুতেই ওরা ক্ষেপে যায়—চীনেরা ভারী মারকুটে জাত—কথায় কথায় ছোরা ছুরি হাঁকড়ায়—’

‘দিয়েছে তো বসিয়ে?’

‘বসিয়ে? না, উঠিয়ে দিলো দোকান থেকে। জুতো জোড়া ওরা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললে জুতো কিনে তোমার কাজ নেই। জুতো না কিনে রসগোল্লা খাওগে। জুতো না কিনে রসগোল্লা খেতে বলল, নাকি, জুতো না খেয়ে রসগোল্লা কিনতে বলল—মানে, কী যে বলল—রসগোল্লা না কিনে জুতো খাও। নাকি, জুতো না খেয়ে রসগোল্লা কেন, নাকি জুতোও খাও—রসগোল্লাও খাও—কী যে বলল—তা আমি ঠিক বলতে পারব না। মোটের ওপর দোকান থেকে ভাগিয়ে দিল ওদের—’

‘জুতো মেরে?’

‘জুতো মেরে দোকান থেকে বেরিয়ে পিণ্টু বলল, ঠিক কথাই বলেছে চীনেটা। চল কোথাও গিয়ে ভালো-মন্দ কিছু খাওয়া যাক।

কাছেই ছিল একটা আপিস ক্যানটিন—সেখানে তারা খেতে গেল। আপিসটার চারতলার ওপরেই রেঁস্তোরাটা—কিন্তু তার সিঁড়িটা এমন নড়বড়ে যে—'

'ভেঙে পড়লো বুঝি হুড়মুড় করে?' মাসিমার আশঙ্কার সীমা থাকে না।

সিঁড়ি ভেঙে তারা উপরে উঠলো। সেই চারতলার মাথায় ছাদের উপরে। ছাদের একধারটায় সিঁড়ির লাগাও একখানা ঘর আছে—সেইটেই ক্যানটিন। বাকীটা খোলা ছাদ। সেধারে কোনো বারান্দার মত নেই। সর্বদাই পড়ে যাবার ভয়। সেধারে দাঁড়ালে গা ছম্‌ছম্‌ করে—একবার যদি পা হড়কালো তো তলার নীচে—পীচের রাস্তায়—ছাত থেকে পড়ে একেবারে ছাতু···

'পড়েনি তো কেউ ছাদ থেকে পিছলে—সেই পীচের রাস্তায়?'

'তাও বলি মাসি, ছাদেও কিছু কম পীচ নেই। পানের পীচে ভর্তি ছাদ। ছাদেও তোমার বেশ পিচকারি। তা, পিন্টুটা কলা খাচ্ছিল আর খোসা ছাড়িয়ে ফেলছিল চারধারে। সিধু আপত্তি করল—খোসাগুলো অমন করে যেখানে সেখানে ফেল না—ওগুলি হেলাফেলার জিনিস নয়। বলল যে, কলাকারু বলে একটা কথা আছে বটে কিন্তু কলার খোসা কারু না। তার ওপর কারু পা পড়লে আর রক্ষে নেই। এমন কি, তোমার ঐ খোসার জন্যেই হয়ত ছাত থেকে—হয়ত বা পৃথিবী থেকেই খসতে হতে পারে কাউকে। শুনে পিন্টু বলল···যা যা, তোকে আর কলার খোসামোদ করতে হবে না।

'কলার খোসামোদ?' ক্ষ্যান্তমাসি হাঁ করে থাকেন, বুঝতে পারেন না। 'কলার খোসামুদি কেউ করে নাকি! কলা রাজা-উজির?'

'কলার খোসা নিয়ে আমোদ করা আর কি! ফেলিস নে খোসাগুলো অমন করে—বলতে না বলতে পটল তুলল।'

অ্যাঁ, হার্টফেল করলো নাকি গো? বলছো কি তুমি বাছা?' ক্ষ্যান্তমাসি ককিয়ে ওঠেন—'পটল তুলল আমার সিধু?'

'পটল সেই খোসাগুলো তুলল। পটল ওরফে পট্‌লা। তুলে ছাদের একধারে রেখে দিল। আর পিন্টু বলল সিধুকে—কলাগুলো বেশ কিন্তু। আরো কলা খাওয়া। মাইনে পেয়েছিস তো আজ? সিধু বলল—যতো খেতে পারিস খা। কাঁদি কাঁদি কলা খাইয়ে কাঁদিয়ে দেব তোকে। তারপর তারা ক্যানটিনে বসে চপ-কাটলেট সাঁটাবার পর ছড়া ছড়া কলা গিলতে লাগলো তিনজনায়। ছাদময় খোসার ছড়াছড়ি—।'

পটলা আবার তুললো খোসাগুলো? মাসি জানতে উৎসুক হন।

তার দায় পড়েছে। তারপরে তারা দুজনে মিলে সিধুকে ধরে নিয়ে গেছে তাদের আড্ডায়। সেখানে গিয়ে—দরজায় খিল এঁটে—চারধার বেশ করে বন্ধ করে—

'গুম করে রেখেছে নাকি সিধুকে?'

'খেলায় বসেছে তারা। ব্রিজ খেলায়…'

এই পর্যন্ত বলে মানতু নিজেই গুম হয়ে থাকে। এর পরের শোচনীয় বার্তাটা কিভাবে ব্যক্ত করবে তার ভাষায় খোঁজ করে। দুঃসংবাদ দেওয়ার নিয়ম এই যে তা আস্তে আস্তে ভাঙতে হয়। দুর্ঘটনা যেমন একলা" আসে না, একে একে, একটার পর একটা এসে—সইয়ে লইয়ে অসহ্য দশায় নিয়ে যায়—অসহনীয় খবরের বেলাও সেই একাদিক্রম। দুঃসংবাদ দানেরও দফাদারি আছে। দফায় দফায় রক্ষা করে শেষ দফায় দফারফা করা।

'ব্রিজ খেলায় বসেছে সিধুরা। ব্রিজ খেলা কি রকম জানো মাসি। তোমাদের সেই সেকেলে গেরাপু খেলা না। গোলাম চোরও নয়। ও হচ্ছে বাজি রেখে খেলা। বারোটা বাজিয়েও খতম হবে না—রাত ভোর চলবে খেলা! এখন অব্দি সিধুর হার হচ্ছে খেলায় বেজায় রকম হারছে সিধু—হেরে হেরে ঢোল হচ্ছে। মাসকাবারের মাইনে প্রায় কাবার। সিধু যেন কি রকম হয়ে গেছে। খেলার নেশায় প্রায় পাগলের মতন। সে বলছে, যে মাটিতে পড়ে লোক, ওঠেও সেই মাটি ধরে। যে খেলায় টাকাগুলো মাটি হোলো

তার থেকেই টাকাগুলো তুলতে হবে। টাকা মাটি—মাটি টাকা। মুক্ত পুরুষের মতই বলছে সে। বলছে যে, হয় বাজি জিতে বেবাক টাকা তুলে বাড়ি ফিরবে নয় তো সে···তারপর আর মানতু বলতে পারে না।

'নয়তো কি আত্মহত্যা করবে নাকি? শিউরে ওঠেন ক্যান্তমাসি।

নয়তো ওর জামা জুতো সব বাঁধা রাখবে। অবশ্যি, পুরনো পচা জামা কেউ নিতে চাইবে কি না সন্দেহ, কিন্তু জামার সঙ্গে সোনার বোতাম আছে, হাত ঘড়িটাও রয়েছে তার। ফাউণ্টেন পেনটাও ছিলো যেন—আমার আসার সময় অব্দি ছিল। দেখে এসেছি আমি! কিন্তু ফিরে গিয়ে ফের দেখতে পাবো কিনা জানি না—'

'সিধুকে ফিরে গিয়ে দেখতে পাবে না?'

'সিধুকে দেখতে পাবো বইকি! কে আর তাকে সিন্দুকে তুলে রাখবে। তবে তার ঘড়ি চেন ফাউণ্টেনপেন আর দেখতে পাব কিনা সন্দেহ। যেমন মরীয়া হয়ে খেলতে লেগেছে সিধুটা আর পাগলের মত ডাক দিচ্ছে—আর সেই সব ডাক ফিরে এসে—বিয়ারিং ডাকের মত ফেরত এসে ডবল খেসারত দিতে হচ্ছে তাকে।'

'কী সব বোনেশে খেলা বাবা!'

তাই—তাই, সিধু আমায় বলল—মানতূ তুই যা ক্যান্তমাসিকে বলগে যে আজ রাত্তিরে আমি বাড়ি ফিরতে পারবো না—মাসি যেন আমার জন্যে না ভাবে। মাসি যেন মনে করে যে আমি মোটর চাপা পড়েছি কি ছাদ থেকে কলার খোসায় পিছলে পড়ে গেছি পীচের রাস্তায়—কি চীনেম্যানে আমাকে ছুরি মেরেছে—কি অমন ভালোমন্দ কিছু একটা আমার হয়ে গেছে—যাহোক কিছু ভেবে নেয়—আমার জন্যে ভাবতে মানা করিস মাসিকে।'

'আহা, কে যেন সেই মুখপোড়ার জন্যে ভাবতে গেছে। ভাবনার যেন কার দায় পড়েছে। ভেবে মরছে যে কে।'

খ্যান্ খ্যান্ করে ওঠেন ক্যান্তমাসি। মানতুর আখ্যান শুনে?

জুজু

এক বাঘের মুল্লুক থেকে আরেক বাঘের মল্লুকে! হাজারিবাগ থেকে বাগেরহাট।

হাজারিবাগে আমার সেজমামার বাড়ি। তাঁর ইলেক্‌ট্রিক্যাল গুড্‌স্‌-এর কারবার। সেই সঙ্গে ছোটখাট একটা কারখানাও ছিল তাঁর। সেখানে বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি জিনিসপত্তর মেরামত হত। মোটরের যন্তরটন্তর, পাখাটাখা, হীটার, মীটার এসব সারাতে জানেন সেজমামা।

বিদ্যুতের কত রকম যে কেরামতি, তা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না। আমিও কিছু কিছু শিখছিলাম সেজমামার কাছে। একদিন সেজমামার মতই ওস্তাদ হব এইরকম আশা মনে মনে পোষণ করছি এমন সময়···

এমন সময়ে বাগেরহাট থেকে মেজমামার তলব এলো—শিবুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে তো একবার। শুনছি ওর শরীরের নাকি তেমন উন্নতি হচ্ছে না। ভাবছি যে আমি একবার চেষ্টা করে দেখি···

চিঠি পেয়ে সেজমামা বললেন, 'যা তাহলে তোর ব্যায়ামবীর মেজমামার কাছে। চেহারাটা বাগিয়ে তারপর আসিস আবার। আবার এসে লাগিস্‌—কেমন?'

চেহারা বাগাতে চলে গেলাম বাগেরহাট।

আমাকে দেখে মেজমামা বললেন, 'ওমা! সেইরকম লিকলিকেই রয়েছিস তো! গায়পায় তো একটুও গত্তি লাগেনি। হাওয়ায় উড়ছিস যে রে! জামাটা খোল ত দেখি॥

জামা খুলতে আমার দারুণ আপত্তি। চানের সময় যে খুলতে হয় তাতেই আমার যেন মাথা কাটা যায়। জামা পরে চান করতে পারলে বাঁচি যেন। কাউকে গা দেখাতে হলেই আমি গায়েব!

মামার কথাটা আমি গায়ে মাখি না, কানে যেন যায়নি কথাটা এমনিভাবে টিপ্‌ করে একটা প্রণাম ঠুকে দিই।

'হবে হবে, পরে হবে প্রণাম—আগে জামাটা খোল।' বলে মেজমামা নিজেই আমার কোটের বোতামগুলো খুলতে লাগলেন। খোলস খুলতেই আমার খোলতাই জাহির হল। 'ওমা, এই চেহারা!' আঁৎকে ওঠেন মেজমামাঃ 'হাড় পাঁজর যে গোনা যাচ্ছে রে সব। দেখি, কখানা, এক দুই তিন চার···।'

আঙ্গুল ঠুকে ঠুকে মেজমামা আমার পাঁজরার অগণ্য হাড় গণনা করেন···

'যাক, এতেই হবে। এই-তোকেই আমি বাগেশ্রী বানিয়ে দেব। একবার বাগে যখন পেয়েছি—দেখিস!'

'মেজমামা, আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন?' ভয়ে ভয়ে বললাম।

'কেন, রাগের কথা কি হল?'

'বললে যে আমায় বাগেশ্রী বানাবে। বাগেশ্রী তো একটা রাগ-রাগিণী।'

আমার গাইয়ে ছোটমামার কাছ থেকে ও খবর আমার জানা ছিল।

'আহা, সে বাগেশ্রী নয়। ও হচ্ছে আলাদা। বাগেশ্রী মানে বাগেরহাটের শ্রী। ওরফে বাগেশ্রী। বাগেরহাটে ফি বছর সুঠাম চেহারার প্রতিযোগিতায় যার দেহ সবচেয়ে সুগঠিত সুন্দর বলে গণ্য হয় সে-ই ওই খেতাব পায়। আসছে বছরের বাগেশ্রী হচ্ছিস তুই!···চ, এবার আমার ব্যায়ামাগার দেখবি চ।'

বলে তিনি উৎসাহভরে আমার পিঠে একটা চাপড় মারলেন। তাঁর সেই স্নেহের চাপড়ানিতে আমি তিন হাত ছিটকে গেলাম। এগিয়ে গেলাম ব্যায়ামাগারের দিকেই।

সেখানে গিয়ে দেখি, ইলাহী কাণ্ড! ছেলেরা তাক ঠুকছে, কুস্তি লড়ছে, ডন-বৈঠক মারছে। ধুলো মাটি মেখে সব কিম্ভূত চেহারা।

মুগুর ডাম্বেল বারবেলের ছড়াছড়ি। তারই একধারে একটা বৈদ্যুতিক ওজনযন্ত্রও রয়েছে। যন্তরটা আমার পরিচিত। সেজ-মামাকে এমন যন্ত্র আমি মেরামত করতে দেখেছি।

আয় তোর ওজনটা নিই একবার।' যন্ত্রটার দিকে মেজমামা আমায় আহ্বান করলেন।

'আজ নয় মেজমামা, তোমার এখানে খেয়েদেয়ে ব্যায়াম-টায়াম করে ওজনটা একটু বাড়ুক আগে, তারপর।' আমি বললাম।

'ছেলেদের শরীরগুলো দেখেছিস?' আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন মেজমামাঃ এখানে ব্যায়াম করে এমনি হয়েছে। আরও হবে। ভালো করে চেয়ে ছাখ।'

না দেখে উপায় নেই। না চাইতেই দেখা দেয় এমনি সব চেহারা। তারস্বরে নিজেদের ব্যায়ামবার্তা ঘোষণা করছে। প্রত্যেকেরই দেহ বেশ সুগঠিত। তার মধ্যে একজনের, বয়স আমার চাইতে তেমন বড় হবে না হয়ত, কিন্তু চেহারায় একেবারে পেল্লায়।

নামেও প্রায় তার কাছাকাছি। মামার ডাকেই জানা গেল।

'পেল্লাদ এদ্দিকে এসো।' মামা তাকে ডাক দিলেন।

পেল্লাদ এগিয়ে এলো। 'একে একটু দেখিয়ে দাও।' বললেন মেজমামা—'একে একচোট দেখাও তো!'

শুনেই আমার পিলে চমকে যায়। কিন্তু না, আমাকে নয়, নিজেকেই সে দেখাতে লাগলো।

সারা দেহটাকে ভেঙে-চুমড়ে বেঁকে এমনভাবে সে দাঁড়ালো যে, হ্যাঁ, দেখবার মতই বটে। গায়ের পায়ের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে ফেঁপে উঠলো সব—ইয়া হলো তার বুকের ছাতি, গলার কাছটা যেন দলা পাকানো—আর, এইসা হাতের কবজি। বক দেখানোর মতন হাতটা চুমড়েছে আর তাইতেই তার বাহুর কাছটা তিন ডবোল হয়ে এমনটা হয়েছে যে ভাবায় তার বর্ণনা করা যায় না। বর্ণনা করা বাহুল্যমাত্র বলে মানে, বাহুর বাহুল্যমাত্র, এই বলেই প্রকাশ করতে হয়।

'এই হচ্ছে আমাদের বাগেশ্রী। আগামী নয়, আসন্ন। এ বছরের পাল্লায় আমরা একেই নামাবো।' মেজমামা জানালেন। এবারের গেল এ, 'আর আসছে বারের মানে, আমাদের আগামী বছরের, বাগেশ্রী হচ্ছিস তুই···'

কথাটা কানে যেতেই পেল্লাদ এমন রোষকষায়িত নেত্রে আমার দিকে তাকালো যে তা আমি ইহজীবনে ভুলবো না। পেল্লাদের চেহারায় যেন জল্লাদের রূপ দেখলাম। এবারের বাগেশ্রীর সারা দেহ তো ফুটে ছিলই, এবার যেন তার চোখের থেকেও বাঘের শ্রী ফেটে পড়তে লাগল। বাঘের মতন হিংস্র দৃষ্টি দেখা দিল তার দু চোখে।

'পেল্লাদ, এবং তোমরা সকলেই শোনো', গলা খাঁকারি দিয়ে ঘোষণা করলেন মেজমামা—'আজ থেকে এ, মানে শিবু, আমার ভাগ্‌নে—এই হবে তোমাদের সর্দার। একে তোমরা শিবুদা বলে ডাকবে। ওরফে রামদাও বলতে পারো। একে তোমরা আমার মতই মেনে চলবে। আর এ যা বলবে, মন দিয়ে পালন করবে তোমরা সবাই—বুঝলে?'

এইভাবে বুঝিয়ে দিয়ে মেজমামা তো ব্যায়ামাগার থেকে চলে গেলেন। আর মেজমামা সরে যেতেই পেল্লাদ ফোঁস করে উঠল সক্কলের আগে—হ্যাঁ, ঐ রামফড়িংকে আমরা রামদা বলবো। ও-তো এক ফুঁয়েই উড়ে যাবে আমার।'

'ফড়িংদা বলে যদি ডাকি পেল্লাদদা? জিগ্যেস করল একটা বাচ্চা ছেলে।

'তা ডাকতে পারিস ইচ্ছে করলে। আমি ড্রাকবো ফড়িং বলে। শুদ্ধু ফড়িং। দাদা-ফাদা বলতে পারব না।' ফড় ফড় করে পোল্লাদ: 'আর ঐ ফড়িংটা যদি আমার কাছে সর্দারি ফলাতে আসে তাহলে এক গাঁট্টায়। না, গাঁট্টা না, আমার অঙ্‌লের এক টোকায় উড়িয়ে দেব তোমায়, বুঝলে বাপু রামফড়িং!'

বলে পেল্লাদ আকাশের গায়ে একটা টোকা মারল। আর পেল্লাদের কাণ্ড দেখে খোকারা হেসে উঠল। হাসল পেল্লাদও। পেল্লাদের আহ্লাদ দেখে আমি আর বাচিনে।

কিন্তু মরণ-বাঁচন সমস্যাটা দেখা দিল তার পরদিন। মামা সকালে উঠে বললেন—'কাল ছেলেদের আমি সব বলে রেখেছি আজ সকালে এসে ব্যায়ামাগারের মাঠের ঘাসগুলো ছাঁটাই করতে। যাও, গিয়ে

দেখো তো কদ্দুর এগুলো। তুমি যখন ওদের সর্দার তখন তোমাকেই তো এখন তদারক করতে হবে এসব। কাজটা করিয়ে নাওগে ওদের দিয়ে।

গিয়ে দেখি, পেল্লাদকে নিয়ে জটলা পাকিয়ে মাঠে বসে আড্ডা মারছে সবাই।

আমি বললাম—'একি! একটা ঘাসের ডগাও তো ছাঁটোনি দেখছি। গল্প করছো সবাই বসে—এদিকে এতটা বেলা গড়িয়ে গেল। নাও, নাও চটপট গা লাগাও সব।'

'যদি না লাগাই তো তুমি কি করতে পারো শুনি?' গর্জে ওঠল পেল্লাদ।

'তাহলে আমাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।' ভারী গলায় আমি ছাড়লাম।

'কী ব্যবস্থা করবে শুনি তো এবার?'

'আমি ··আমি···মনে···মনে' বলে আমি একটা ঢোঁক গিললাম। তাতে আমার মানের যে খুব হানি হল বুঝতে পারলাম বেশ।—'আমি বলছিলাম কি', আমতা আমতা করে বললাম—'বৃথা আলস্যে কালাতিপাত না করে তোমরা নিজেদের কর্তব্য কর্মে লিপ্ত হও ভ্রাতৃবৃন্দ। এই কথাই বলছিলাম আমি।'

সাধু উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই আমার বলা, এইটে জানাবার জন্যই সাধুভাষা ব্যবহার করলাম।

'যদি না লিপ্ত হই? বলে পেল্লাদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মারমূর্তি ধরে আমার সামনে খাড়া হল সে।'

'তাহলে···তাহলে কি তুমি আমায় মারবে নাকি?'

'না না। সে কথা কি আমি বলেছি? তোমার মতন ছেলেকে কি আমি কখনো মারতে পারি?' যথাসাধ্য আত্মমর্যাদা বজায় রেখে বলি: 'তবে আমি বলছি কি, তোমরা যদি চটপট ঘাস ছাঁটতে না লাগো তাহলে ভীষণ প্যাঁচে পড়বে।

'কিসের প্যাঁচ?'

'জুজুৎসুর। এমন জুজুৎসুর প্যাঁচ করে দেব যে এক মিনিটের মধ্যে হাড়গোড় ভাঙা দ হয়ে যাবে তুমি।'

'জুজুৎসু?'

'কেন, জুজুৎসুর নাম কি শোনোনি নাকি কখনো? একরকমের জাপানী এসরত। একশো গুণ গায়ের জোর বেশী এমন একটা পালোয়ানকে একরত্তি একটা জাপানী ছেলে ছুটো আঙুলের কায়দায় একেবারে ঘায়েল করে দিতে পারে—শোনোনি কখনো?'

পেল্লাদের একটা সাকরেদ মাথা নেড়ে জানালো যে এমন কথা সে শুনেছে বটে।

'তুমি জানো জুজুৎসু?' জিগ্যেস করল পেল্লাদ। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে।

'জানি কিনা টের পাবে এই দণ্ডেই। কিন্তু ভগবান না করুন—যেন আমায় তা না জানাতে হয়। এর আগে একটা গুণ্ডা ছুরি নিয়ে আমায় তাড়া করেছিল, তাকে আমি ঐ প্যাঁচে ফেলেছিলাম। বেচারাকে পাক্কা ছ মাস হাসপাতালে কাটাতে হল! মারা যেতে যেতে বেঁচে গেল কোনোরকমে।'

'তবে রে ব্যাটা রামফড়িং! তুই আমাকে জুজুৎসুর প্যাঁচে ফেলবি?' এই না বলে পেল্লাদ একলাফে এগিয়ে এসে আমার ঘাড় ধরলো। ঘাড়ের কাছটায় কোটের কলার ধরে আমাকে উঁচু করে তুলল আকাশে।—'প্যাঁচটা তবে ছাখ এইবার। তোকে তুলে এমন এক আছাড় মারবো...' বলে সে কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে সুর করে আওড়ালে...'মারিব আছাড়। ভাঙিয়ে মাথার খুলি চূর্ণ হবে হাড়।'

ত্রিশঙ্কুর মতই হল আমার অবস্থা। ত্রিশূন্যে উঠে আমি হাত-পা ছুঁড়তে লাগলাম—'ভালো—ভালো হচ্ছে না কিন্তু। এমনিভাবে আমাকে ঘাড় ধরে তোলা...আমি আঙুলের কায়দা দেখাতে পারছি না কিনা...যদি একবার তোমায় আমার আঙুলের নাগালে পাই তো দেখতে পাবে মজাটা।'

'তুই আমায় মজা দেখাবি? বটে রে ব্যাটা রামফড়িং?' বলে সে আমাকে নামিয়ে দিল মাটিতে: 'তার আগে এক ঘুষিতে—

আমার হাতের এই এক ঘুষিতে তোর মাথাটা আমি চ্যাপটা করে দেব—নাক-মুখ সব নিয়ে তোর মাথাটা—বসিয়ে দেব তোর গলার ভেতর···কোটের কলারের তলায়···ঘাড়টাড় সমেত। কন্ধকাটার মতন ঘুরে বেড়াবি তখন।'

'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি পেল্লাদ', আমার গলা ঘড়ঘড় করে ঃ 'ফের যদি তুমি এরকম বেয়াদবি করো তো তোমাকে পরজন্মে গিয়েও পস্তাতে হবে। ভালো কথায় বলছি, খুব বেঁচে গেলে এ যাত্রা।'

পেল্লাদ, বলতে কি, এবার একটু ভ্যাবাচাকা খেয়েছে। আমি বেশ ভড়কে যাব ও ভেবেছিল। কিন্তু এততেও আমার মুখসাপট দেখে ও একটু ঘাবড়ে গেল।

'দাঁড়া, এবার তোকে ঠ্যাং ধরে তুলবো আকাশে।' বলে এগিয়ে এসেও আমার শ্রীচরণে হাত দেবার তার কোনো তাড়া দেখা গেল না। অদূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো আমায়।

তারপরে একটু নরম হয়ে বলল—না। আগে তুমি আমায় এক ঘা মারো! আমি আইন বাঁচিয়েই চলতে চাই। তারপরে তোমায় ধরে আমি তুলো ধুনে দিচ্ছি। বলতে পারব তখন যে আগে আমার গায় তুমি হাত তুলেছিলে। মারো আমায় এক ঘা আগে।

সে বুক চিতিয়ে খাড়া হল আমার সামনে।

'না, আমি তোমার গায়ে হাত দেব না। ভদ্রলোক কি মারামারি করে? ভদ্র বালকও তা করে না। কেন, মারামারি করা ছাড়া কি গায়ের জোরের পরীক্ষা হয় না? আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো, আমি সর্দার হওয়াতে তোমার খুব রাগ হয়েছে আমার ওপর, তাই না?'

'ঠিক তাই।' মেনে নিল সে···'ইচ্ছে করছে, আস্ত তোমায় চিবিয়ে খাই।'

'আমি কি করব?' আমি তো নিজের থেকে সর্দার হতে চাইনি, মামা করেছে। আমি কি করব? বেশ, আমাদের মধ্যে কার গায়ের জোর বেশী তার পরীক্ষা হয়ে যাক। যার বেশী জোর সে-ই সর্দার

হবে, তাকে সর্দার বলে মানবে সবাই—এর ওপর তো কোনো কথা নেই? কেমন তো? সেই হবে সর্দার। তার কথায় সবাইকে চলতে হবে তখন। কেমন, এতে রাজী?'

'হ্যাঁ, রাজী।' সায় দিলে পেল্লাদ। ছেলেরাও বেশ জোরদার উৎসাহ দেখাল।

'বেশ, ঐ যে বারবেলটা পড়ে আছে ওখানে—ওজনদাঁড়ির ওপর' —অদূরে দাঁড় করা বৈদ্যুতিক ওজন-দাঁড়িটার পাটাতনে একটা সের পনেরর লোহার বারবেল পড়েছিল—সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বললাম—'ঐ বারবেলটা যে মাথার ওপর তুলতে পারবে…'

'ঐ বারবেল তো আমি দুবেলা ভাঁজি।' কথার মাঝখানেই বাঁধা দিল পেল্লাদ—'মাথার ওপর ঘোরাই দুবেলা। বুঝেছ হে?'

'বেশ তো, তুলেই দেখাও না একবার। পরীক্ষাটা হয়ে যাক সবার সামনে।' আমি বললাম।

'বেশ, তুমি আগে তোলো তো দেখি। তোমার জোরটা দেখা যাক একবার। তোলো দেখি।'

ছেলেরাও বলতে লাগলো—'তোলো রামদা, তোলো!'

এত তোলো তোলো শুনে তুলাদণ্ডের ওপর থেকে বারবেলটাকে তুলতে হোলো। বলতে কি, তুলতে গিয়ে বেগ পেলাম বেশ। দু'হাতে না সাপটে ধরে অতিকষ্টে হাঁটুর উপর তুললাম, তারপর আস্তে আস্তে কাঁধ বরাবর। শেষে প্রাণান্ত এক পরিশ্রমে মাথার ওপর খাড়া করলাম ওটাকে।

'এইবার তোমার পালা!' বারবেলটাকে নামিয়ে রেখে আমি দেয়ালে গিয়ে ঠেস দিয়ে হাঁফ ছাড়তে লাগলাম। বাপ্‌!

পেল্লাদ এসে পাকড়ালো বারবেলটাকে। —'এক ঝটকায় তুলে ফেলব ছাখো না! তোরা সবাই চেয়ে ছাখ।'

বলে বারবেলটাকে ধরে এক ঝট্‌কা মারতে গেল সে। মারতে গিয়ে, কী আশ্চর্য! অবাক্‌ কাণ্ড! পট্‌কালো সে আপনাকেই। উল্‌টে পড়লো মেজেয়!

'হাত পিছলে গেল কিনা।' বলে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো পেল্লাদ। মাটিতে হাত ঘষে লাগতে গেল আবার ; কিন্তু —তার ঐ লাগাই সার, বাগাতে পারল না একটুও ওটাকে। এক ইঞ্চিও নড়াতে পারল না বারবেল। আমি ঠায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মৃদুমধুর হাসতে লাগলাম।

ওর বাহুর পেশী ডবোল হয়ে উঠলো—আবার দেখা গেল তার বাহুল্য। বুক ফুলে উঠলো দেড়গুণ। হাপরের মতন নিশ্বাস পড়তে লাগল ওর। কিন্তু এক চুলও তুলতে পারল না বারবেলটা।

'যাও, কাজে মন দাও গে।' বললাম আমি তখন ; 'সাফ করে ফ্যালো মাঠটা। মাঠ পরিষ্কার না হলে আমাদের বার্ষিক উৎসব হবে কি করে? এ বছরের সভা বসবে তো ঐখানেই, বাগেরহাটের ইতর-ভদ্র দেখতে আসবে সবাই। আর, সেই সভায় তুমিই তো এবার বাগেশ্রী হবে, পেল্লাদ। তোমার গরজই তো সবার বেশী হওয়া উচিত ভাই।'

'হাঁ রামদা' বলে সদলবলে নতমস্তকে সে চলে গেল। সর্দার বলে মনে মনে মেনে নিল আমায়।

তারপর পেল্লাদের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল খুব। সে আমার বিশেষ ভক্ত হল একজন।

'সেদিন সন্ধ্যাতেই সে এসে শুধালো আমায়—'এই তো আমি এইমাত্র সেই বারবেলটা ভেঁজে এলাম। সকালে আমি তুলতে পারলাম না কেন বল তো? বল না রামদা তুমি কি আমায় কোনো জুজুৎসু করেছিলে?

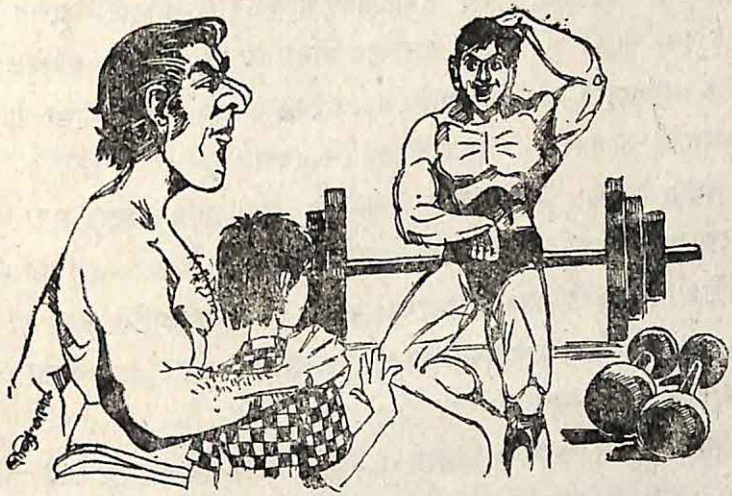
'বারে। আমি তোমায় ছুঁতে গেলাম কখন? প্রতিবাদ করি আমি : না ছুঁয়ে কি কাউকে জুত করা যায়? জুজুৎসুও করা যায় না।'

'তাহলে বুঝি ওই বারবেলটাকেই···? ওটা তো তুমি আগেই ছুঁয়েছিলে। বেশ জুত করেই তুলেছিলে আমার আগে।'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো।' বলে আমি ঘাড় নাড়ি—যে ঘাড়

'তাই। তুমি জানতে যে, জুজুৎসুর প্যাঁচ কষে দিয়েছ ওটাকে। কিছুতেই আমি আর তুলতে পারব না। তাই তুমি দেয়ালে হেলান দিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিলে অমনি করে—আমি লক্ষ্য করেছিলাম।'

যে রহস্য বাল্যকালে পেল্লাদের কাছে আমি ব্যক্ত করতে পারিনি, আজ সেটা ফাঁস করবার আমার বাধা নেই!



হাজারিবাগের মামার কাছ থেকে আসবার সময় আমি একটা বিদ্যুৎ-চুম্বক বাগিয়ে আনি। আর সেদিন সকালে বাগেরহাটের মাতুল-সাক্ষাতের আগে, সেটাকে বৈদ্যুতিক ওজন-যন্ত্রটার পাটাতন তুলে তার ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলাম। তারপরে পেল্লাদ বারবেলটা তুলবার সময় যখন আমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে মৃদুমধুর হাসছিলাম তখন আমার পিঠের পেছনে যে ইলেকট্রিক সুইচ ছিল, চেপে ধরেছিলাম সেটাকে। ফলে ওজন-যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে উপজাত বৈদ্যুৎ চৌম্বক বারবেলটাকে প্রচণ্ড শক্তিতে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। ওটাকে তুলতে হলে গোটা ওজনযন্ত্র সমেত তখন তুলতে হত পেল্লাদকে। যার মোট ওজন তখন পেল্লাদের পাঁচশো গুণ।

আমার বৈদ্যুতিক মামার দৌলতে এটা জানা ছিল।

এক দুর্যোগের রাত্রে

বিদ্যুৎ চমকানোতে ভারী ভয় পায় মেয়েরা। বিশেষ করে পিসীজাতীয় মেয়েরা। যদি পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতায়, কিংবা ইস্কুলের টেক্সট্ বুক পড়েও এ কথাটা আমাদের জানা থাকত তাহ'লে গরমের ছুটিতে মুকুন্দপুরে কখনই আমি মরতে যেতাম না। অজ্ পাড়া-গাঁ মুকুন্দপুরে—সাধারণতঃ পিসীদেরই সেখানে বসবাস।

বাবা বল্লেন,—"যা অনেক দিন ধরে লেখালেখি করছে তরু। তোকে কবে সেই ছোটবেলায় দেখেছে, দেখতে চায় একবার। তারিণীও খুব খুসী হবে। গরমের ছুটিটা সেখানেই কাটিয়ে আয় না কেন? গান্ধীজীও বলেছেন—ব্যাক টু ভিলেজ, তার মানে আবার গ্রামে যাও।"

বাবা দারুণ ভক্ত গান্ধীজীর। আমি প্রতিবাদ করতে চাই—"উহুঁ। তা কি করে হয় বাবা? ব্যাক টু ভিলেজ মানে হবে গ্রামের দিকে পিঠ ফেরাও। অর্থাৎ কিনা সহরেও থাক।'

"তাই নাকি?" বাবা মাথা চুল্‌কোতে থাকে—"তা হলে ও দুইই হয়। গ্রামেও থাক, সহরেও থাক।"

মা ঘাড় নাড়েন—"তা কেন হবে? ব্যাক্ টু ভিলেজ মানে হল তোমার পিঠ দাও গ্রামকে, অর্থাৎ কিনা গ্রামকেই তোমার পীঠস্থান কর। তার মানে, গ্রামেই পিঠ দিয়ে পড়ে থাক চিৎ হয়ে।"

মা-র বাক্যে বাবার উৎসাহ হয় "তবে তো গান্ধীজীর ব্যাখ্যাই ঠিক তা হলে! হুম্?" আমার বাবা নিদারুণ ভক্ত গান্ধীজীর! "গান্ধীর কথা তবে শুনতেই হবে তোকে। তা ছাড়া; এখন আমের সময়, পাড়াগাঁয় আম প্রচুর। কিনে খেতে হয় না, আমবাগানে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ালেই টুপ্ টাপ্ পড়বে। হাতেই এসে পড়বে। মাথাতেও পড়তে পারে। সেই যে রবি ঠাকুরের কবিতাটি—"সেই

মনে পড়ে জৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়াবার ধুম—”

হাত ঝেড়ে মাথা নেড়ে বেশ আবৃত্তি সুরু করেছিলেন বাবা। কিন্তু ধুমেই এসে ধুম্ করে তাঁকে থেমে পড়তে হয়। তারপর আর মনে পড়ে না। না বাবার, না আমার। আর মা? কবিতার ধার দিয়েই মা যান না। ও-জিনিস তাঁর দু-কর্ণের বিষ।

যাক্, অবশেষে রাজীই হলাম। গান্ধীজীর কথায় নয়, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের আশ্বাসে।

আমের আশায় আমার মুকুন্দপুর আসা। এসেই দেখলাম পিসীরা ভ্রাতুষ্পুত্র বৎসল হয়, বিশেষ করে পিস্তুতো ভাই-বোন যদি না গজিয়ে থাকে। আমার আদর-যত্নের আর অবধি থাকল না। মার কাছেও কখনো এত ভালোবাসা পাই নি। মনে মনেই আমি এর একটা ব্যাকরণ-সঙ্গত সূত্র রচনা করে নিই। মা? মা হচ্ছেন শুধুই মা, সীমার মধ্যে তিনি। কিন্তু পিসীমা? তাঁর পরিসীমা কোথায়?

হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম। বিদ্যুতের সঙ্গে মেয়েদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়ত আছে, কিংবা কিছু বৈদ্যুতিক অংশও তাঁদের মধ্যে থেকে পাওয়া অসম্ভব নয়—তা না হলে বিদ্যুৎ-চমক সুরু হলে মেয়েরাও চম্কাতে থাকে কেন? আমার মাকেও চম্কাতে দেখেছি। বিনিকেও দেখেছি। কিন্তু পিসীমার মত কাউকে নয়। একটা নেংটি ইঁদুরের সামনেও তিনি অকুতোভয়ে অটল থাকবেন হয় তো,—কিন্তু বিদ্যুৎ চমকালে পিসীমা? তক্ষুণি খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছেন।

সেই দুর্যোগের রাতের কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে। ভাবলে এখনো হৃৎকম্প হয়। ‘ক্যালামিটি’ কখনো একা না, খাঁটিই এ কথা। সে রাত্রে তারিণীবাবুও বাড়ী নেই (সম্পর্কে তিনিই আমার পিসেমশাই), পাশের গ্রামে গেছেন; জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন, তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। ফিরবেন কিনা কে জানে।

বাড়ীতে কেবল পিসিমা আর আমি। কাজেই খাওয়া-দাওয়ার

হাঙ্গামা চুকাতে বেশী দেরি হ'ল না। রাত দশটার মধ্যেই সব খতম। দরজা, জানালার ছিটকিনি সমস্ত ভালো করে বন্ধ করবার পিসীমার হুকুম হয়ে গেল। আপত্তির সুরে আমি বলি—"দরজায় তো খিল এঁটেছি, কিন্তু যা গরম পিসীমা! জানালাগুলো বন্ধ করলে তো মারা যেতে হবে।"

"গরমে লোক মারা যায় না", পিসীমা বলেন, "চোরের হাতেই মারা যায়, ডাকাতের হাতেই মারা যায়। জানালা খোলা রাখলে চোর-ডাকাত লাফিয়ে আসতে পারে তা জানিস্? তার ওপরে উনি আবার বাড়ী নাই—সামলাবে কে?"

যেন উনি বাড়ী থাকলেই সামলাতে পারতেন! পিসে হতে পারেন কিন্তু চোর-ডাকাতকে ধরে পিষে ফেলবেন এত ক্ষমতা নেই ওঁর! আমার মন্তব্য কিন্তু মনে মনেই আমি উচ্চারণ করি। ততক্ষণে পিসীমা কোন জানালার একটা খড়খড়িও ফাঁক রাখলেন না।

অন্ধকার ঘরে দারুণ গুমোটের মধ্যে ছটফট করতে করতে কখন একটু তন্দ্রার মত এসেছে, এমন সময়ে—

ক্কড়্—ক্কড়্—ক্কড়্—ক্কড়াৎ···

আচমকা জেগে উঠি। তৎক্ষণাৎ ঘরের অন্য কোণ থেকে পিসীমার আর্তনাদ শোনা যায়। "মণ্টু! ও মণ্টু!"

"পিসীমা! কি পিসীমা?"

"চৌকির তলায় সেঁধিয়ে যা। দেরী করিস্ নে।"

আমি উঠে বসি। চৌকির তলায় সেধুব কেন? চোর-টোর লাফিয়ে এল নাকি? কিন্তু দোর-জানলা তো বন্ধ, ঘর তেমনি অন্ধকার—আসবেই বা কি করে? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে থাকি।

"ঢুকেছিস্?"

"উঁহু।"

"ঢুকিস্ নি এখনো? সর্বনাশ করলি তুই। ঢুকে পড় চট করে!"

"কেন, কি হয়েছে পিসীমা ?"

"এখনো কথা বলে ! কি হয়েছে ? আকাশে বিদ্যুৎ হানছে যে বাজ পড়ল শুনলি না ?—" পিসীমা ক্ষেপে ওঠেন—"এখন কি তর্ক করার সময় ? বলছি না ঢুকে পড়তে—"

পিসীমার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। ক্কড়্—ক্কড়্—ক্কড়্ ক্কড়াৎ—দুম্—দুম্। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলক জানালার ফাঁকে-ফাঁকে ঝলসে ওঠে।

"মরল ছেলেটা ! আমাকেও বেঘোরে মারল।" চাপা কান্নার শব্দ আসে।

কি করি ? হামাগুড়ি দিয়ে সেঁধোতে হয় চৌকির তলায়।

"ঢুকেছি পিসীমা।" – করুণ স্বরে বলি।

"ঢুকেছিস্ ? আ ! বাঁচালি। ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতের সময় কি বিছানায় থাকতে আছে ? শুয়ে পড়িস্ নি তো চৌকির তলায় ?"

"নাঃ। হামাগুড়ি দিয়ে আছি।"

"হামাগুড়ি দিয়ে ? কি সর্বনাশ ! বিদ্যুৎ চমকানোর সময়ে কি কেউ হামাগুড়ি দেয় ? হাত-পা গুটিয়ে আসন-পিঁড়ি হয়ে বস।"

উদ্যমের সূত্রপাতেই কিন্তু সংঘর্ষ বাধে। কি করে বসব ? চৌকি লাগছে যে মাথায়।"

"ভারী বিপদ করলে ! এই সময়ে আবার চৌকি লাগছে মাথায় !" পিসীমা চেঁচাতে থাকেন, "এই কি মাথায় চৌকি লাগবার সময় ? মাথায় করে সোজা হয়ে বস।"

"উঁহু। মাথায় করা যায় না, বেজায় ভারী যে।" পিসীমাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি, "পিসেমশাই আর আমি দু'জনে হলে পারা যেত।"

সত্যি, আমার একার পক্ষে অত বড় চৌকি মাথায় করা অসম্ভব —দস্তুর মত অসম্ভব। আর, কেবল মাথায় করে বসে থাকা।

"কি করছিস, মন্ট" পিসীমা হাঁক ছাড়েন।

"চৌকির তলাতেই আছি। হাত-পা গুটিয়েই বসেছি। ঘাড় হেঁট করে।"

"ঘাড় হেঁট করে? তবেই মারা গেলি। এই সময়ে মাথা সোজা করে রাখার নিয়ম যে! চৌকির তলাতেই থাকতে হবে, কিন্তু মাথা উঁচু করে থাকা চাই। তোকে নিয়ে কি করি বল্ তো? একে এই দুর্যোগ—চৌকি কাঁধে করার জন্যে এখন তোর পিসেমশাইকে আমি পাই কোথায়?—"

অকস্মাৎ বিদ্যুতের চমকে পিসীমার বাক্য বাধা পায়। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ কড়াক্কড়্ আওয়াজ এবং পিসীমার আর্তনাদ।

"হায় মা কালী। হায় মা দুর্গা। কি বিপদ না ডেকে আনছে ছেলেটা, কি করি এখন, হায় মা—"

আমিও মনে মনে বলি, "হায় মা।" দাঁতে ঠোঁট কামড়াই কি করি এখন? ওদিকে পিসীমার চিৎকার, এদিকে দশমণি চৌকি! ঐতিহাসিক ব্যক্তি নই যে অসাধ্যসাধন করতে পারব। অসম্ভব কাজ কেবল ওরাই পারে। আমার কান্না আসে।

আবার বিদ্যুতের ঝলকানি আর বজ্রপাতের শব্দ।

"দেখলি, দেখলি তো? তোর ঘাড় হেঁট করে থাকায় কি সর্বনাশ হচ্ছে! নিজেও মরবি—আমাকেও মারবি তুই—" পুনরায় পিসিমার ফোঁসফোঁসানি সুরু হয়।

"উঠোনে ঘটিবাটি পড়ে নেই তো? তাহলেই অক্কা পেয়েছি। পেতল-কাঁসার বাসনে ভারী বিদ্যুৎ টানে—"

"গিয়ে দেখে আসব পিসীমা?"

এই তটস্থ দুরবস্থা থেকে যে কোনও পথে পরিত্রাণের সুযোগ পেতে চাই।

পিসীমা কিন্তু ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, "বাহিরে যাবি তুই? এই বিপদের মুখে? কি আক্কেল তোর বল দেখি? তোর চেয়ে ঘটিবাটির দামটাই বেশী হল?" একটু থেমেই আবার সেই প্রশ্নাঘাত, "ঘাড় সোজা করলি?

চৌকির তলায় থাকা এবং মাথা উঁচু করে থাকা যখন একাধারে সম্ভব নয়, তখন অগত্যা ওর আওতা পরিত্যাগ করে বেরিয়ে আসি। এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, এবং মাথা উঁচু করে। উঃ, ঘাড়টা কি টনটনই না করছে! দারুণ গরম চৌকির তলায় প্রাণ একেবারে গলায়-গলায় এসেছিল।

"ঘাড় উঁচু করেই আছি পিসীমা!"—অকপটেই বলি।

"আহা, বাঁচিয়েছিস।" পিসীমার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে।—"লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, যাদু ছেলে। যা বলি শোন। আজকের ভয়ানক রাতটা কেটে যাক, মা দুর্গা করুন, কাল তোকে পিঠে করে খাওয়াব। এ কি, কি করছিস আবার?—"

"দেশলাই জ্বালছি লণ্ঠন ধরাব। যা অন্ধকার—"

"কি সর্বনাশ। এই সময়ে কেউ আলো জ্বালে?" পিসীমা শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন—"আলোয় যে রকম বিদ্যুৎ টেনে আনে এমন আর কিছুতে নানা ভরে ফ্যাল—এক্ষুণি। (কড়—কড়—কড়াৎ—বাম্ বাম্) দেখলি তো, কি করলি তুই।"

"আমি কি করব? ও তো আপনি হচ্ছে। দেশলায়ে বিদ্যুৎ টেনে আনে কিনা তা তুমিই জান, কিন্তু সৃষ্টি করতে পারে না তো?" আমি একটু বিরক্ত হয়েই বলি।

"এই কি বক্তৃতা করবার সময়? তুই কি মরতে চাস্? আমাকেও মারতে চাস সেই সঙ্গে?"

আমি চুপ করে থাকি। কি করব?

"সেই সপ্তবজ্র-নিবারণের মন্ত্রটা মনে আছে তোর? চেঁচিয়ে বল্। বজ্রাঘাত থেকে বাঁচতে হলে—ওঃ, কি বিচ্ছিরি রাত। কালকের সকাল দেখতে পাব কি না মা-কালীই জানেন! কই, পড়ছিস্ না?"

"জানিই না তো পড়ব কি?"

"কি মুখ্য ছেলেটা। এও জানিস্ না? ইস্কুলে কি ছাই শেখায় তোদের? অশ্বত্থামা বলি ব্যাস হনুমন্ত বিভীষণ। কৃপাচার্য দ্রোণাচার্য সপ্তবজ্র নিবারণ। ঘন ঘন আওড়া!"

আওড়াতে থাকি কি আর করব ?

শ্লোকপাঠের মধ্যিখানে আর এক দুর্ঘটনা। পিসীমার পোষা বেড়ালটা কখন আমার পায়ের তলায় এসে হাজির হয়েছে। বেড়ালে আমার ভারী ভয়। লাফিয়ে উঠি আমি। বেড়ালের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায় বেড়ালের গায়েই পা চাপিয়ে দিই।

"ম্যাও—" মন্টু—চাপা পড়ে বেড়ালটাও ত্রাহি ত্রাহি করে।—"মিউ—মিয়াও।"

"ধুত্তোর! অন্ধকারে যে ধারে পা বাড়াই সেখানেই বেড়াল। ও যেন একাই একশ'। সর্বদা পায়ের সঙ্গে লেগেই আছে। পদে পদে এ রকম বেড়ালের উৎপাতের চেয়ে বজ্রপাতও আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

"মন্টু!" পিসীমার শাসনের কণ্ঠ শুনি, "এই কি আমোদের সময়? আবার বেড়াল ডাকা হচ্ছে?"

"আমি ডাকি নি পিসীমা।"

তবে কে ডাকতে গেল? তোমার পিসেমশাই? এমন মিথ্যে-বাদী হয়েছ তুমি? ছি! লিখে দেব দাদাকে চিঠিতে, যে তোমার ছেলে যতই বড় হচ্ছে ততই—"

"সত্যিই বলছি পিসীমা, আমি ডাকি নি। আমি কেন ডাকব? বেড়াল—"

আমার কথা শেষ হতে পায় না—"বল কে বেড়াল ডাকল তবে? কার এত সখ? ভূতে ডাকতে গেল?" পিসীমার কণ্ঠস্বর কঠোর হয়।

"উহু। বেড়াল নিজেই।"

"অ্যাঁ?" আবার পিসীমার আর্তনাদ। তিনি যে বেশ বিচলিত হয়েছেন, অন্ধকারের মধ্যেই আমি তা টের পাই। "বেড়াল! তবেই হয়েছে! আমাদের রক্ষা নেই! বেড়াল ভয়ানক বিদ্যুৎবাহী! বেড়ালের রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিদ্যুৎ—বইয়েতেই লিখে দিয়েছে। কি সর্বনাশ। হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে বাবা অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস—"

"বাবা নয় বাবারা।—"আমি ওকে সংশোধন করে দিই—"বহুবচন বলছ যে পিসীমা!"

"এই সময়ে আবার ইয়ার্কি?" পিসীমা ধমক দেন, "হে বাবা হনুমন্ত, হে বাবা বিভীষণ, ছোঁড়াকে বাঁচাও। অবোধ ছেলের অপরাধ নিয়ো না বাবা! (কড়—কড়—কড়াৎ—বম্‌বম্—বম্‌বম্! পিসীমা যান ক্ষেপে) এখনো বুঝি ধরে আছিস্ বেড়ালটাকে? ছুঁড়ে ফেলে দে—ছুঁড়ে ফ্যাল—এই দণ্ডে।"

ছুঁড়ে ফেলা শক্ত হয়, কেন না বেড়ালকে ধারণ করি নি ত! কিন্তু পিসীমার আদেশ রাখতেই হবে—যে করেই হোক। অন্ধকারেই আন্দাজ করে বেড়ালের উদ্দেশ্যে এক শূট্ ছাড়ি। শূট্ গিয়ে লাগবি ত' লাগ্—লাগে এক তেপায়া টেবিলে; তাতে ছিল পিসেমশায়ের ওষুধ-পত্রের শিশি (যত রাজ্যের সৌখীন ব্যারাম সব পিশেমশায়ের একচেটে)—সেই এক ধাক্কাতেই টেবিল চিৎপাৎ এবং শিশি-বোতল সব চুরমার।

পিসীমা গোঁ গোঁ করতে থাকেন; অজ্ঞান হয়ে গেলেন কিনা এই ঘুটঘুট্টির মধ্যে তো বোঝবার যো নেই! কিন্তু যখন জানেন ঘরের মধ্যে বজ্রপাত নয়, নিতান্তই টেবিলপাত—যখন তাঁর গোঙানি থামে, আপনিই সামলে ওঠেন।

"যাক্, ভগবান্ খুব বাঁচিয়েছেন এবার। ওটাকে ঝেড়ে ফেলেছিস্ তো? বেশ করেছিস্! (অন্য সময় হলে তাঁর আদরের মেনির গায়ে কাউকে হাত ঠেকাতেও দেন না, কিন্তু এখন বিদ্যুতের সামনে বেড়ালের ওপরেও পিসীমার চিত্ত নেই)। তুই এক কাজ কর মণ্টু, ঐ তেপায়াটার ওপর দাঁড়া। কাঠের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-চলাচল করে না। চেয়ার কিংবা টেবিলের ওপর দাঁড়ানোই এখন সব চেয়ে নিরাপদ। দাঁড়িয়েছিস্?"

"উঁহু—"

(ব্যাশ ক্কড় ক্কড়াৎ—ববম্ বম্—বম্ বম্!)

"কি দস্যি ছেলে বাবা। দাঁড়াস্ নি এখনও? তুই কি আমাকে পাগল করবি? হে মা দুর্গা—"

"দাঁড়িয়েছি পিসীমা!"

(বিদ্যুতের ঝলক—দুদদাম্ দমাদ্দম্—কড়—কড়—কড়াৎ!)

"এমন দুর্যোগের রাত কাটলে হয়! দোহাই মা দুর্গা! তোর পিসেমশাই কাল এসে আমাদের জ্যান্ত দেখবে কি না কে জানে। পরের ছেলেকে এনে কি বিপদেই পড়লুম! দাদাকে আমি কৈফিয়ত দেব কি?—"

অতি সন্তর্পণে এবং সসঙ্কোচে ক্ষীণকায় তেপায়ার ওপর সসেমিরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। নীরবে পিসীমার কাতরোক্তি শুনি।

"মণ্টু, ভূমিকম্পের সময় কি করে রে? শাঁখ, ঘণ্টা বাজায় না? ওতেই ভূমিকম্প থেমে যায়—নয় কি? ঝড়-বৃষ্টি কি ভূমিকম্পের চেয়ে কম মারাত্মক? আয়, আমরা শাঁখ, ঘণ্টা বাজাই—তা' হলে ঝড়-বৃষ্টিও থামবে। শাঁখ কুলুঙ্গিতেই আছে, আমি নিচ্ছি। ওধারের তাক থেকে ঘণ্টাটা তুই পেড়ে আন। অন্ধকারে পারবি তো?"

অন্ধকারেই আমি ঘাড় নাড়ি।

"এনেছিস? বড্ড দেরী করিস্ তুই। বাঁচতে আর দিলি না আমাদের।"

তাকের এবং শাঁখের অন্বেষণে তিনটে চেয়ার ওল্টাই, গোটাকতক গেলাস ফেলি, জলের কুঁজোকে নিপাত করি?—"এনেছি পিসিমা।"

বেশ এবার ঐ তেপায়াটার ওপর দাঁড়া। খুব জোরে পেট্—আকাশ দেবতারা শুনতে পান। আমি শাঁখ বাজাচ্ছি।'

পিসীমা শাঁখ বাজান, আমি ঘণ্টা পিটি। প্রাণপ্রণেই পিটি। কানের সমস্ত পোকা বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ একটা জানালা খুলে যায়, একটা ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। চোর নাকি? পিসীমা ভয়ে কাঠ হয়ে যান। আমিও ঘণ্টাবাদ্য থামাই।

"ডাকাত পড়েছে নাকি ?"—ছায়ামূর্তি বলে.—"তোরা কি লাগিয়েছিস্ মণ্টে ? এ সব কি কাণ্ড ?"

"বিদ্যুৎ তাড়াচ্ছি পিসেমশাই !" করুণ কণ্ঠে আমি বলি।

"বিদ্যুৎ। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, বিনা মেঘে বিদ্যুৎ ? এমন খাসা চাঁদনী রাত—আর তোদের কাছে বজ্রপাত ? বাইরে চেয়ে দেখ দেখি।"

তাহলে বাইরে তাকিয়ে দেখি পরিষ্কার ধবধবে জ্যোৎস্না। আমি ও পিসীমা দু'জনেই দেখি। পিসীমা বলেন,—তাহলে এত দুম্‌দাম বজ্রপাতের শব্দ, বিদ্যুতের ঝলকানি—এসব কিছুই না ?"

"ও, ওই আওয়াজ ?" পিসেমশায়ের উচ্চহাস্য আরম্ভ হয়—"জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন কিনা। কলকাতা থেকে যত রাজ্যের বাজির অর্ডার দিয়েছেন। রাত এগারোটার ট্রেনে সেসব পৌঁছল —বোমা, পট্‌কা, তুবড়ি, উড়ন-তুবড়ি, হাউই—আরও কত কি। এতক্ষণ তো বাজি পোড়ানোই হচ্ছিল—তারই ঝলক দেখেছ, তারই আওয়াজ শুনেছ তোমরা।"

পিসেমশাইয়ের হাসি আর থামতে চায় না।

———

ঘটোৎকচ-বধ

সেই বছরই সে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হল।

যেমন ষণ্ডামার্কা চেহারা, তার উপরে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—চুলে তেলও দিত না, চিরুনিও না। রুক্ষ রুক্ষ চুলে তাকে দেখাতো ঠিক গুণ্ডার মতো। নামটাও তার বিদঘুটে, সেটা মনে রাখা বা মুখে আনা সহজ ছিল না। উপাধি ছিল ঘটক, সবাই তাই ধরেই তাকে ডাকতো।

আমি বলতাম, ঘটক না ঘটোৎকচ! সেটা অবশ্য মনে মনে!

তার সঙ্গে বিবাদ করা তো বিপজ্জনক ছিলই, বন্ধুত্বও নিরাপদ ছিল না। —কি রে ভালো আছিস? বলে সে যখন বন্ধুর পিঠে বিরাশী-সিকের আদর বসাতো, তখন তার জবাবে ভালো আছি জানানো নেহাত মিথ্যা কথা হত। বরং 'হ্যাঁ, একটু আগে ছিলাম' বললেই যথার্থ উত্তর হত। অকস্মাৎ অমন কিল খাওয়ার পর মানুষ কখনো ভালো থাকতে পারে?

নিঃস্বার্থভাবে চড়-চাপড় বসানো ছাড়াও তার আরও গুণ ছিল। ক্লাসের প্রায় প্রত্যেক ছেলের একটা করে অদ্ভুত নাম সে বের করেছিল। সেই নামে তাদের ডাকতো—যাকে ডাকা হতো তখন সে ছাড়া আর সবাই খুব হাসতো। একদিন সে আমাকেই ডেকে বসল—কিগো লট্‌পট্ সিং কি হচ্ছে?

নতুন নামে দস্তুরমতো আপত্তি ছিল আমার। বিশেষ করে এতে আমার চেহারার প্রতি কটাক্ষ ছিল, কেন না ভারি রোগা ছিলাম আমি। কাজেই আমার রাগ হয়ে গেল। বলে ফেললাম, আর তুমি কী? তুমি যে আস্ত একটি ঘটোৎকচ!

বলে ভালো করলাম না। সেটা পরমুহূর্তেই টের পেলাম। টের পেলাম নিজের পিঠে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা আমি আদপেই পছন্দ করি না।

তখুনি কিন্তু আমি তার শোধ তুলেছিলাম। অবশ্য আর এক দিক

দিয়ে। সে পিরিয়ডটা ছিল ইংরেজীর, কিন্তু আমাদের ইংরেজীর সার সেদিন স্কুলে আসেননি। ক্লাসে ভারি গোল হচ্ছিল, তাই হেডমাস্টার মশাই নিজে আমাদের ক্লাস নিতে এলেন। ঘটোৎকচ নিজের সীট ছেড়ে চলে এসেছিল, সে তাড়াতাড়ি আমার পাশেই বসে পড়ল।

হেডমাস্টার মশাই তাকেই প্রথম প্রশ্ন করলেন, মুখে মুখে ট্রান্স্লেট কর, ক্লাসে বড় গোল হচ্ছিল।

সে আমার হাত টিপে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, গোলের ইংরেজি কীরে ? আমি চুপি চুপি উত্তর দিলাম, রাউণ্ড।

—আহা সে গোল নয়···গো—ল।

—কি গোল ? ফুটবল খেলার গোল ? সে তো জি-ও-এ-এল।

—দূর ছাই, তা নয়—

হেডমাস্টার মশাই তাড়া দিলেন, সোজা ট্রান্স্লেশন, এত দেরি কিসের ?

উপায় না দেখে সে বলে ফেলল—There was much rounds in the class.

হেডমাস্টার মশাই এত অবাক হয়ে গেলেন যে তাকে কিছু না বলে আমাকে বললেন তার কান মলে দিতে। তারপর তাকে ছেড়ে আর সব ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কান মলে দিতে দিতে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, much নয়, ওটা big rounds হবে—বড় গোল কিনা।

সে-কথা কানে না তুলে সে বললে, যা জোরে মলেছিস, আচ্ছা, দেখব তোকে ছুটির পর।

সমস্ত ক্লাস ঘুরে আবার তার পালা এল, হেডমাস্টার মশাই তাকে প্রশ্ন করলেন, আমি ঐ কাপড়টি পরি,—পারবে এটা ?

বড় রকমের ঘাড় নেড়ে সে বলল, হ্যাঁ।

বলল এবং উঠেও দাঁড়াল, কিন্তু তার পরে আর কোন উচ্চবাচ্য নেই। মুখ নড়তে থাকে কিন্তু মুখ আর খোলে না। ভাবটা যেন এই যে এর অনেক রকম উত্তর তার জিভের গোড়ায় এসেছে, কিন্তু কোন্‌টা বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

আর বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না দেখে সে আমাকে একটা চিমটি কাটল, নীচু গলায় বলল, কাপড় পরা কি হবে রে ?

—না, আমি বলব না। তুমি যে ছুটির পর আমাকে দেখাবে বলেছ।

—না ভাই, দেখাব না, তুই লিখে দে।

আমি তার রাফ খাতাটা টেনে নিয়ে দেখার সুবিধার জন্য এক পাতা জুড়ে বড় বড় ছাঁদে লিখলাম—কাপড় পরা—to read the cloth.

সে তখন চট্‌পট্‌ উত্তর দিল ; আই রীড দ্যাট ক্লথ।

হেডমাস্টার মশায়ের বিস্ময় তখন সপ্তমে উঠেছে—য়্যাঁ ? কাপড় পরার ইংরেজী তুমি জানো না ? পরার ইংরেজী ! পরা !

—পড়ার ইংরেজী ? পড়া—পড়া ? ও। মনে পড়েছে—to fall।

Stand up on the bench. সমস্ত ঘণ্টা থাকবে, নেমেছ কি ফাইন। —বলে হেডমাস্টার মশাই চলে গেলেন। ক্লাশসুদ্ধ সবাই ঘটোৎকচের এই দুরবস্থাটা উপভোগ করলাম। যখন তখন মুষ্টিযোগের জন্য আমরা কে না ওর উপর চটা ছিলাম ?

বলা বাহুল্য, সেদিন শেষ পিরিয়ডে আমার বেজায় পেট কামড়াতে লাগল। ক্লাস-টিচারের কাছে ছুটি নিয়ে বেরুচ্ছি, ঘটোৎকচ বইয়ের আড়াল থেকে ঘুষি দেখাল। ভাবখানা যেন এই—বড্ড ফসকে গেলি আজ। তা বলে তোর নিস্তার নেই !

তার পরদিন কিন্তু তার সঙ্গে আমার ভারি ভাব হয়ে গেল। হলও খুব অদ্ভুত রকমে।

বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে একটা ছারপোকা ভারি কামড়াচ্ছিল আঙুলে, অনেক কষ্টে তাকে খুজে বের করে খতম করতে যাচ্ছি, সে বলে উঠল, আহা আহা, মারিস নে, মারিস নে, মরে যাবে। অমন করে বেচারাকে মারিস নে।

সহপাঠীর প্রতি যে এত নিষ্ঠুর, ছারপোকার প্রতি তার এমন মমতা ! বিস্মিত হয়ে বললাম, তবে কি করব একে ? মাটিতে ছেড়ে দি ?

সে ব্যস্ত হয়ে বলল, আরে না না, পালিয়ে যাবে যে ! দাঁড়া।—আহা

বেশ ছারপোকাটি তো। কেমন মোটাসোটা! নধর নধর। বেশ চাকন চিকন! দেখতেও চমৎকার! গায়ের রঙে কালচে লাল আর লালচে কালো একসঙ্গে মিশ খেয়েছে। এ রকম আমার একটিও নেই।

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম—বলে কি এ?

—ছারপোকাটা দিবি আমায়? তাহলে আর তোকে মারব না। কোনোদিন না।

আমি বললাম, এক্ষুনি, এক্ষুনি। যেখানে তোমার খুশি একে নিয়ে যাও।

খুব আনন্দিত হয়ে পকেট থেকে একটা বেঁটে চেহারার গোলমুখো শিশি সে বার করল। ও বাবা! তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ছারপোকা। লাখ লাখ না হলেও হাজার হাজার তো বটেই! আমার উপহারটিকে সযত্নে তার মধ্যে পুরে নিয়ে বলল—এতেই ধরে রাখি ওদের। আমার অনেক দিনের পোষা!

—পাখী, খরগোস এ সব লোকে পোষে দেখেছি। ছারপোকা আবার কেউ পোষে না কি?

ছারপোকার তুই কি জানিস? আমি অনেক দিন থেকে ওদের সঙ্গে মিশছি, ওদের নাড়ী নক্ষত্র সব আমার জানা। ওদের বুদ্ধির কথা ভাবলে—

কিন্তু টীচার ক্লাসে এসে পড়ায় ছারপোকার কাহিনী মাঝখানেই তাকে থামাতে হল। সেজন্য সে ক্ষুণ্ণ হল বিশেষ।

টিফিনের সময় পাশের গ্রামের টীম আমাদের চ্যালেঞ্জ করল ফুটবল ম্যাচে। ওরা ভারি গোঁয়ার—হারতে থাকলেই ওদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, বল ছেড়ে অপর দলকে ধরে পিটতে শুরু করে দেয়। গত বছর আমাদের বেচারামের পা ভেঙে দিয়েছিল, তার স্কোরেই ওরা one-nill-এ হেরে যায়। তাই ওদের সঙ্গে খেলতে আমাদের উৎসাহ ছিল না।

কিন্তু ঘটোৎকচ বলল, আরে এবার আমি আছি। ভয় কিসের! সব তুলো ধুনে দেব!

কিন্তু মাঠে গিয়ে ঘটোৎকচ হল গোলকীপার! আমরা বললাম, না-না, তুই আমাদের সঙ্গে ফরোয়ার্ডে আয়।

সে বলল—আরে এখন কি! খেলা শেষ হোক না! তখন ধুনে দেব।

বেচারামের কথা আমার মনে পড়ল! বেচারার পা সেরেছে বটে কিন্তু জীবনে তাকে বল ছুতে হবে না। অবশ্য পা-ভাঙাকে আমি কেয়ার করি না, আরাম করে বিছানায় শুয়ে থাকা তো! কিন্তু আসছে হপ্তায় মামার বাড়ি যাব যে—। আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম যেন আমরা হেরে যাই, অনেক গোল খেয়ে এমন ঢোল হারা-হারি যে, ওরা খুশী হয়ে সন্দেশ খাওয়ায়!

কিন্তু হারব যে তার কোন উপায় দেখা গেল না। ওরা বল নিয়ে এগুতেই পারে না—এগোনো দূরে থাক, নিজেদের গোল-এরিয়ার ভেতর থেকে বল ক্লিয়ার করাই ওদের মুস্কিল! বিপদ অনিবার্য দেখে আমি খুব সাবধানে খেলতে লাগলাম—পাছে ওদের না গোল দিয়ে ফেলি। আমাদের কেউ শুট করেছে, তাতে গোল নির্ঘাত বাধ্য হয়ে আমাকে বল আটকে গোল বাঁচাতে হয়। কর্নার হতে যাচ্ছে, ওদের হয়ে কর্নারের বল কেড়ে নিয়ে আমিই আউট করে দিই!

কিন্তু কপালের লেখন খণ্ডাবে কে? ভাবলাম এবার আস্তে একটা শুট করি, গোলকিপার অনায়াসেই তা আটকে ফেলবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই বলটাই গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে গোল হয়ে গেল। তারপর থেকেই ওরা যেমন করে আমাকে ছেঁকে ধরল, তাতে বাধ্য হয়ে ব্যাকের সঙ্গে আমাকে জায়গা বদল করতে হল। প্রাণের ভয় আমি করি না, কিন্তু পা বাঁচাতে হবে তো! মামার বাড়ি রয়েছে।

গোল খেয়ে ওরা একটু গোঁ করে খেলতে লাগল। দু-একবার বল নিয়ে এগিয়েও এল, কিন্তু গোল দেবার কোন লক্ষণই তাদের দেখলাম না। দৈবাৎ যদি গোলটা শোধ হয়ে যায় তো বাঁচা যায়। খেলা সেরে আমাদের ফিরতে তো সন্ধ্যো,—হারলে ওরা কি আর আস্ত ফিরতে দেবে?

অবশেষে অনেকক্ষণ পরে ওরা একটা শুট করল গোলের মুখে। ঘটোৎকচ ভাবল আমি শুট ফিরিয়ে দেব, কিন্তু আমি দেখলাম এ সুযোগ আর ছাড়া নয়। বলটা ছেড়ে দিয়ে ঘটোৎকচকে এমনভাবে আড়াল করলাম যে আটকাবার কোন সুবিধেই সে পেল না।

গোল দিয়ে ওরা যা লাফাতে লাগল—সে এক দৃশ্য! দেখে আমার

আনন্দ হল ! তারপর শেষ দশ মিনিট দ্বিগুণ উৎসাহে ওরা আমাদের চেপে রইল। কোনো রকমে আর একটা গোল খেলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ভাবলাম আশা সফল হবে, কিন্তু এমনি ওদের শুট করার কায়দা যে গোলে মারলে সে বল গোলপোস্টকে সেলাম ঠুকে দশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে যায় ! সময় উত্তীর্ণ হয় দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না, নিজেই নিজের গোলে শুট করে দিলাম। আমিও গোল দিলাম আর খেলাও ওভার হল।

ওদের হাত থেকে তো কোনো গতিকে বাঁচলাম, কিন্তু পড়লাম ঘটোৎকচের কবলে। গোড়ায় জিতিয়ে আমিই শেষে ডুবিয়ে দেব, এমনটা ও আশা করেনি। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম ভাই, খেলা আর পরীক্ষা ও-দুটোই হচ্ছে 'লাক'! পড়লে-শুনলেও কিছু হয় না, ভালো করে খেললেও নয়। এই তো তুমি এত পড় কিন্তু কাল ক্লাসে হেডমাস্টারের কাছে—! বরাত ভাই, বরাত !

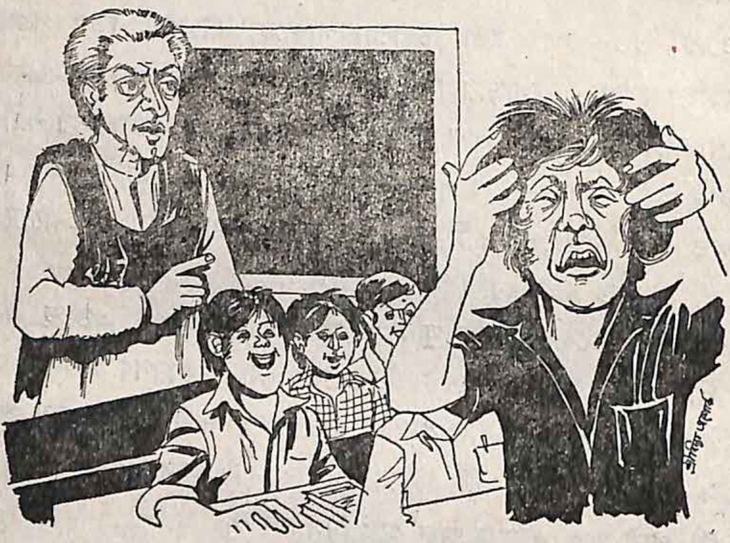
কিন্তু ও কি বোঝবার ? ঘুষি বাগিয়ে আমার দিকে এগুচ্ছে, এমন সময়ে সাঁই করে কোত্থেকে একটা ইট এসে পড়ল। তারপর আর একটা। ভেবেছিলাম জিতলে ওদের রাগ পড়বে, হয়তো সন্দেশ খাওয়াবে, কিন্তু শেষে কি না জলযোগের বদলে এই ইট-যোগ ! আমরা আর কোন দিকে না চেয়ে পাঁই পাঁই করে দৌড়তে শুরু করে দিলাম।

খানিক দূর দৌড়ে দেখি আর ইট আসছে না, কিন্তু ঘটোৎকচ কই ? সে তো আমাদের সঙ্গে নেই ! তবে কি সে একাই তাদের তুলো ধুনতে লেগে গেছে না কি ? যে গোঁয়ার সে—সব পারে। ফিরলাম তার খোঁজে। দেখি, সে এক গাছে উঠে বসে আছে। আমরা কোথায় ছুটে মরছি আর সে কি না নিরাপদে গাছে চেপে অবলীলাক্রমে তাদের ইট চালানো আর আমাদের দৌড়ঝাপ দেখছে মজা করে ! আমাদের দেখে সে গাছ থেকে নামল। নেমেই আমার দিকে চেয়ে বলল, কাল ইস্কুলে এর শোধ তুলব। তারপর সমস্ত রাস্তা আর কোনো কথাই সে বলল না।

পরদিন আমি ক্লাসে গেলাম ইস্কুল বসে গেলে পরে। আমি যাবা মাত্রই

ঘটোৎকচ কট্মট্ করে আমার দিকে চাইল, তারপর টীচারের কাছে বাইরে যাবার অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। খানিকবাদেই সে ফিরে এল, কিন্তু ফিরে নিজের জায়গায় না গিয়ে এসে বসল আমার পাশে! আমি মনে মনে কাঁপতে লাগলাম এই বুঝি কোপ বসায়।

মাস্টার মশাই ক্লাসে ছিলেন বলে বিশেষ কিছু করতে পারছিল না, কিন্তু যা এক একটা রাম-চিমটি কাটছিল তাতেই বুঝিয়ে দিচ্ছিল মাস্টার মশাই চলে গেলে ওর কিলগুলো কি আন্দাজের হবে। আত্মরক্ষার জন্য আমি



মরিয়া হয়ে উঠলাম। আস্তে আস্তে ওর পকেট থেকে ছারপোকার শিশিটা বার করে নিলাম! সুযোগ বুঝে ছিপি খুলে তার অর্ধেক ছারপোকা ওর মাথায় ছেড়ে দিয়ে আবার শিশিটা তেমনি ওর পকেটে রেখে দিলাম।

একটু পরেই ঘটোৎকচ একেবারে লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই তার দারুণ চীৎকার! তার পরেই সে দুহাতে ভীষণভাবে মাথা চুলকাতে লাগল!

ব্যস্ত হয়ে টীচার জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, হল কি তোমার?

ক্লাসের সব ছেলে অবাক হয়ে ওকে দেখছিল, বিকৃত মুখে ও জবাব দিল, ভয়ানক কামড়াচ্ছে।

—চুল ছিঁড়লে কি মাথা কামড়ানো সারে? যাও, জল-খাবারের ঘরে গিয়ে চুপ করে শুয়ে থাক গে।

—মাথার ভেতরে নয়, বাইরে সার।

—বাইরে মাথা কামড়াচ্ছে, সে আবার কি? মাথার বাইরে মাথা কামড়ায়? ততক্ষণে ঘটোৎকচ ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। সকলে মিলে তখন তার মস্তক পরীক্ষায় লাগা গেল, কিন্তু ঝাঁকড়া চুলের দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতরে বাঘ কি ভালুক কিছু আবিষ্কার করা কঠিন। ছারপোকারাও ছিল অনেক দিনের উপোসী—ছাড়া পেয়ে তারা আত্মহারা হয়ে কামড়াচ্ছিল।

গোলমাল শুনে হেডমাস্টার মশাই এলেন, সমস্ত ক্লাস ছেড়ে ছেলেরা ছুটে এলো। হট্টগোলে সেদিন ইস্কুল গেল ভেঙে, কিন্তু ঘটোৎকচের লম্ফ-ঝম্ফ দেখে কে! ডাক্তার এলেন, কিন্তু তিনিও এই নতুন ধরণের মাথাব্যথার কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না।

অবশেষে এল নাপিত। কিন্তু মাথা মুড়োতে ঘটোৎকচ ভয়ানক নারাজ, তার অমন সাধের চুল—বোধ হয় ছারপোকার পরেই সে ভালোবাসে চুলকে। কিন্তু চুল না গেলে প্রাণ যায়, তাই অগত্যা ন্যাড়া হতে হল তাকে।

পরদিন ঘটোৎকচকে আর চেনাই যায় না! চুলের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উৎসাহ তার উবে গেছে। সে আর মুখও চালায় না, হাতও নয়। শান্ত শিষ্ট, গম্ভীর গোবেচারা—একেবারে আলাদা লোক। চুলের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার মাথা কাটা গেছল।

ছারপোকার নাড়ী-নক্ষত্র সব সে জানতো, কিন্তু তবু একটা বিষয় তার জানা ছিল না। ওরা বিশ্বাসঘাতক—যে আশ্রয় দেয়, এমন কি যে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তাকেও ওরা কামড়াতে ছাড়ে না, তারও সর্বনাশ ওরা করতে পারে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা-বোধ ওদের নেই,—এটা সে আগে জানতো না। তাই ওদের এই ব্যবহারে ওর হৃদয়ে লেগেছিল। আর হৃদয়ে আঘাত লাগলে মানুষের বুঝি এমনি হয়।

আমার বাঘ শিকার

মুখের দ্বারা বাঘ মারা কঠিন নয়। অনেকে বড় বড় কেঁদো বাঘকে কাঁদো কাঁদো মুখে আধমরা করে ঐ দ্বারপথে এনে ফেলেন। কিন্তু মুখের দ্বারা ছাড়াও বাঘ মারা যায়। আমিই মেরেছি।

মহারাজ বললেন, বাঘ-শিকারে যাচ্ছি। যাবে আমাদের সঙ্গে ?

'না' বলতে পারলাম না। এতদিন ধরে তাঁর অতিথি হয়ে নানাবিধ চর্বচোষ্য খেয়ে অবশেষে বাঘের খাদ্য হবার সময়ে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলে না। কেমন যেন চক্ষুলজ্জায় বাধে।

হয়তো বাগে পেয়ে বাঘই আমায় শিকার করে বসবে ? তবু মহারাজার আমন্ত্রণ কি করে অস্বীকার করি ? বুক কেঁপে উঠলেও হাসি হাসি মুখ করে বললাম, চলুন, যাওয়া যাক। ক্ষতি কি ?

মহারাজার রাজ্য জঙ্গলের জন্যে এবং জঙ্গল বাঘের জন্যে বিখ্যাত। এর পরে তিনি কোথাকার মহারাজ, তা বোধহয় না বললেও চলে। বলতে অবশ্য কোন বাধা ছিল না, আমার পক্ষে তো নয়ই, কেন না রাজামহারাজার সঙ্গেও আমার দহরম-মহরম আছে—সেটা বেফাঁস হয়ে গেলে আমার বাজার দর হয়ত একটু বাড়তোই। কিন্তু মুশকিল এই, টের পেলে মহারাজ হয়তো আমার বিরুদ্ধে মানহানির দাবি আনতে পারেন—এবং টের পাওয়া হয়তো অসম্ভব ছিল না। মহারাজ না পড়ুন, মহারাজকুমারেরা যে আমার লেখা পড়েন না, এমন কথা হলফ করে বলা কঠিন। তাছাড়া আমি যে পাড়ায় থাকি, যে গুণ্ডাপাড়ায়, কোনো মহারাজার সঙ্গে আমার খাতির আছে ধরা পড়লে তারা সবাই মিলে আমাকে একঘরে করে দেবে। অতএব সব দিক ভেবে স্থান, কাল, পাত্র চেপে যাওয়াই ভালো।

এবার আসল গল্পে আসা যাক।

শিকার-যাত্রা তো বেরোল। হাতীর উপরে হাওদা চড়ানো, তার উপরে

বন্দুক হাতে শিকারীরা চড়াও ডজনখানেক হাতী চার পায়ে মশ মশ করতে করতে বেরিয়ে পড়েছে। সব আগের হাতীতে চলেছেন রাজ্যের সেনাপতি। তারপর পাত্র-মিত্র-মন্ত্রীদের হাতী ; মাঝখানে প্রকাণ্ড এক দাঁতালো হাতীতে মশগূল হয়ে স্বয়ং মহারাজা ; তাঁর পরের হাতীটাতেই একমাত্র আমি এবং আমার পরেও ডানহাতি, বাঁহাতি আরো গোটা কয়েক হাতী ! তাতে অপাত্র-অমিত্ররা ! হাতীতে হাতীতে যাকে বলে ধূল পরিমাণ ! এত ধুলো উড়ল যে দৃষ্টি অন্ধ, পথঘাট অন্ধকার—তার পরিমাণ করা যায় না।

জঙ্গল ভেঙে চলেছি। বাঁধা রাস্তা পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ,—এখন আর মশ মশ নয়, মড় মড় করে চলেছি। এই 'মর্মর-ধ্বনি কেন জাগিল রে !' ভেবে না পেয়ে হতচকিত শেয়াল, খরগোশ, কাঠবেড়ালীর দল এধারে ওধারে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে, শাখায় শাখায় পাখীদের কিচির-মিচির, আর আমরা কারো পরোয়া না করে চলেছি। হাতীরা কারো খাতির করে না।

চলেছি তো কতক্ষণ ধরে। কিন্তু কোনো বাঘের ধড় দূরে থাক, একটা ল্যাজও চোখে পড়ে না। হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর কিসের সোরগোল শোনা গেল। কোত্থেকে একদল বুনো জংলী লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। তারা বনের মধ্যে ঢুকে কি করছিল কে জানে ! মহারাজা হয়তো বাঘের বিরুদ্ধে তাদের গুপ্তচর লাগিয়ে থাকবেন। তারা বাঘের খবর নিয়ে এসেছে মনে হতেই আমার গায়ে ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু তারা বাঘের বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করে হাত-তী হাত-তী বলে চেঁচাতে লাগল।

হাত-তী তো কি ? হাতী যে তা তো দেখতেই পাচ্ছ—হাতী কি কখনো দেখনি না কি ? ও নিয়ে অমন হৈ চৈ করবার কি আছে ? হাতীর কানের কাছে ওই চেঁচামেচি আর চোখের সামনে ওরকম লম্ফঝম্ফ আমার ভালো লাগে না। হাতীরা বন্য ব্যবহারে চটে গিয়ে ক্ষেপে যায় যদি ? হাতী বলে কি মানুষ নয় ? হাতীরও তো মানমর্যাদা, আত্মসম্মানবোধ থাকতে পারে !

মহারাজাকে কথাটা আমি বললাম। তিনি জানালেন যে, আমাদের

হাতীর বিষয়ে ওরা উল্লেখ করছে না, একপাল বুনো হাতী এদিকেই তাড়া করে আসছে, সেই কথাই ওরা তারস্বরে জানাচ্ছে! এবং কথাটা খুব ভয়ের কথা। তারা এসে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। হাতী এবং হাওদা সমেত সবাইকে আমাদের দ'লে পিষে মাড়িয়ে একেবারে ময়দা বানিয়ে দেবে।

তৎক্ষণাৎ হাতীদের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া হল। কথায় বলে হস্তি-যুথ, কিন্তু তাদের ঘোরানো-ফেরানোর এত বেজুত যে বলা যায় না। যাই হোক কোন রকমে তো হাতীর পাল ঘুরল, তারপরে এল পালাবার পালা।

আমার পাশ দিয়ে হাতী চালিয়ে যাবার সময় মহারাজা বলে গেলেন, খবরদার! হাতীর থেকে একচুল যেন ন'ড় না। যত বড় বিপদই আসুক, হাতীর পিঠে লেপটে থাকবে। দরকার হলে দাঁতে কামড়ে, বুঝেছ?

বুঝতে বিলম্ব হয় না। দূরাগত বুনোদের বজ্রনাদী বৃংহণধ্বনি শোনা যাচ্ছিল—সেই ধ্বনি হন হন করতে করতে এগিয়ে আসছে! আরো—আরো কাছে, আরো আরো কাছিয়ে। ডালে ডালে বাঁদররা কিচমিচিয়ে উঠেছে। আমার সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। ঘেমে নেয়ে গেলাম।

এদিকে আমাদের দলের আর আর হাতীরা বেশ এগিয়ে গেছে। আমার হাতীটা কিন্তু চলতে পারে না। পদে পদে তার যেন কিসের বাধা! মহারাজার হাতী এত দূর এগিয়ে গেছে যে, তার লেজ পর্যন্ত দেখা যায় না। আর সব হাতীরাও যেন ছুটতে লেগেছে। কিন্তু আমার হাতীটার হল কি। সে যেন নিজের বিপুল বপুকে টেনে নিয়ে কোনো রকমে চলেছে।

আমাদের দলের অগ্রণী হাতীরা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর এধারে বুনো হাতীর পাল পেল্লায় ডাক ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসছে—ক্রমশই তার আওয়াজ জোরাল হতে থাকে। আমার মাহুতটাও হয়েছে বাচ্চা। কিন্তু বাচ্চা হলেও সে-ই তখন আমাদের একমাত্র ভরসা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হে! তোমার হাতী চলছে না কেন? জোরসে চালাও। দেখছ কি?

জোরে আর কি চালাব হুজুর? তিন পায়ে হাতী আর কত জোরে চলবে বলুন? দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বললে।

—তিন পা! তিন পা কেন? হাতীদের তো চার পা হয়ে থাকে বলেই জানি। অবশ্য, এখন পিঠে বসে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু চার পা দেখেই উঠেছিলাম বলে যেন মনে হচ্ছে। অবশ্য, ভালো করে ঠিক খেয়াল করিনি।

—এর একটা পা কাঠের যে! পেছনের পা-টা। খানায় পড়ে পা ভেঙে গেছল। রাজাসাহেব হাতীটাকে মারতে রাজী হলেন না, সাহেব ডাক্তার এসে পা কেটে বাদ দিয়ে কাঠের পা জুড়ে দিয়ে গেল। এমন রঙ বার্নিশ যে ধরবার কিছু জো নেই। ইস্ট্রাপ দিয়ে বাঁধা কি না!

শুনে মুগ্ধ হলাম। ডাক্তার সাহেব কেবল হাতীর পা-ই নয়, আমার গলাও সেইসঙ্গে কেটে রেখে গেছেন। আবার মহারাজেরও এমন মহিমা, কেবল বেছে বেছে খোঁড়া হাতীই নয়, দুগ্ধপোষ্য একটা খুদে মাহুতের হাতে অসহায় আমায় সমর্পণ করে সরে পড়লেন।

—কাঠের হাতী নিয়ে বাচ্চা ছেলে তুমি কি করে চালাবে? আমি অবাক হয়ে যাই।

বার্লি আমার নাম, সে সগর্বে জানাল,—আর আমি হাতী চালাতে জানব না?

—বার্লি? ভারি অদ্ভুত নাম তো!—আমার বিস্ময় লাগে।

—আমি সাবুর ভাই। সাবু আমেরিকায় গেছে ছবি তুলতে।

—তোমার বার্লিনে যাওয়া উচিত ছিল। না বলে আমি পারলাম না।

—গেলে ভালো করতে।

শোনবামাত্রই নিজের ভুল শোধরাতেই কি না কে জানে, তৎক্ষণাৎ সে হাতীর ঘাড় থেকে নেমে পড়ল। নেমেই বার্লিনের উদ্দেশ্যেই কি না কে বলবে, দে ছুট! দেখতে দেখতে আর তার দেখা নেই। জঙ্গলের আড়ালে হাওয়া।

আমি আর আমার হাতী, কেবল এই দুটি প্রাণী পেছনে পড়ে রইলাম।

আর পেছন থেকে তেড়ে আসছে পাগলা হাতীর পাল! তেপায়া হাতীর পিঠে নিরুপায় এক হস্তিমূর্খ।

কিন্তু ভাববার সময় ছিল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাজ পড়ার মতো আওয়াজ চার ধার থেকে আমাদের ছেয়ে ফেলল। গাছপালার মড়মড়ানির সঙ্গে চোখ ধাঁধানো ধুলোর ঝড়! তার ঝাপটায় আমার দম আটকে গেল একেবারে।

মহারাজার উপদেশ মতো আমি এক চুল নড়িনি, হাতীর পিঠে লেপটে সেঁটে রইলাম! হাতীর পাল যেমন প্রলয়নাচন নাচতে নাচতে এসেছিল, তেমনি হাঁক-ডাক ছাড়তে ছাড়তে নিজের ধান্দায় চলে গেল।

তারা উধাও হলে আমি হাতীর পিঠ থেকে নামলাম। নামলাম না বলে খসে পড়লাম বলাই ঠিক। হাতে পায়ে যা খিল ধরেছিল! নীচে নেমে একটু হাত-পা খেলিয়ে নিচ্ছি, ও-মা, আমার কয়েক গজ দূরে এ কি দৃশ্য! লম্বা চওড়া বেঁটে খাটো গোটা পাঁচেক বাঘ একেবারে কাত হয়ে শুয়ে! কর্তা, গিন্নী, কাচ্চা-বাচ্চা সমেত পুরো একটি ব্যাঘ্র-পরিবার। হাতীর তাড়নায়, হয়তো বা তাদের পদচারণায়, কে জানে, হতচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

কাছাকাছি কোনও জলাশয় থাকলে কাপড় ভিজিয়ে এনে ওদের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে পারলে হয়তো বা জ্ঞান ফেরানো যায়। কিন্তু এই বিভুঁয়ে কোথায় জলের আড্ডা, আমার জানা নেই। তাছাড়া, বাঘের চৈতন্য-সম্পাদন করা আমার অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্গত কি না, সে বিষয়েও আমার একটু সংশয় ছিল।

আমি করলাম কি, প্রবীণ বনস্পতিদের ঘাড় বেয়ে যেসব ঝুরি নেমেছিল তারই গোটাকতক টেনে ছিঁড়ে এনে বাঘগুলোকে একে একে সব পিছমোড়া করে বাঁধলাম। হাত, পা, মুখ বেঁধে-ছেঁদে সবাইকে পুঁটলি বানিয়ে ফেলা হল—তখনো ব্যাটারা অজ্ঞান।

হাতীটা এতক্ষণ ধরে নিস্পৃহভাবে আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। এবার উৎসাহ পেয়ে এগিয়ে এসে তার লম্বা শুঁড় দিয়ে এক একটাকে তুলে

ধরে নিজের পিঠের উপর চালান দিতে লাগল। সবাই উঠে গেলে পর সব শেষে ওর ল্যাজ ধরে আমিও উঠলাম। তখনো বাঘগুলো অচেতন। সেই অবস্থাতেই হাওদার সঙ্গে শক্ত করে আর এক প্রস্থ ওদের বেঁধে ফেলা হল।

পাঁচ-পাঁচটা আস্ত বাঘ—একটাও মরা নয়, সবাই জলজ্যান্ত। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম নিশ্বাস পড়ছে বেশ। এতগুলো জ্যান্ত বাঘ একাধারে দেখলে কার না আনন্দ হয়? একদিনের এক চোটে এক সঙ্গে এতগুলো শিকার নিজের ল্যাজে বেঁধে নিয়ে ফেরা—এ কি কম কথা?

গজেন্দ্রগমনে তারপর তো আমরা রাজধানীতে ফিরলাম। বাচ্চা মাহুত বার্লি ব্যগ্র হয়ে আমাদের প্রতীক্ষা করছিল। এখন অতগুলো বাঘ আর বাঘান্তক আমাকে দেখে বারংবার সে নিজের চোখ মুছতে লাগল। এরকম দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

খবর পেয়ে মহারাজা ছুটে এলেন। বাঘদের হাওদা থেকে নামানো হল। ততক্ষণে তাদের জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু হাত পা বাঁধা—বন্দী নেহাৎ। নইলে, পারলে পরে, তারাও বার্লির মতো একবার চোখ কচলে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করতো।

এতগুলো বাঘকে আমি একা স্বহস্তে শিকার করেছি, এটা বিশ্বাস করা বাঘদের পক্ষেও যেমন কঠিন, মহারাজার পক্ষেও তেমনি কঠোর। কিন্তু চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে দেখলে অবিশ্বাস করবার কিছু ছিল না।

কেবল বার্লি একবার ঘাড় নাড়বার চেষ্টা করেছিল—এতগুলো বাঘকে আপনি একলা—হাতিয়ার নেই, কুছ নেই—বৃহৎ তাজ্জব কি বাত···।

আরে হাতিয়ার নেই, তো কী, হাত তো ছিল? বাধা দিয়ে বলতে হল আমায়। আর, তোমার হাতীর পা-ই তো ছিল হে। তাই কি কম হাতিয়ার? বাঘগুলোকে সামনে পাবামাত্রই, বন্দুক নেই টন্দুক নেই করি কি, হাতীর কাঠের পা-খানাই খুলে নিলাম। খুলে নিয়ে দু হাতে তাই দিয়েই এলোপাতাড়ি বসাতে লাগলাম। ঘা কতক দিতেই সব ঠাণ্ডা। হাতীর পদাঘাত—সে কি কম নাকি! অবশ্য তোমাদের হাতীকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। বলবামাত্র পেছনের পা দান করতে সে পেছ-পা হয়নি। আমিও

আবার কাজ সেরে তেমনি করেই তার ইস্ট্রাপ লাগিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যিস্, তুমি হাতীটার কেঠো পায়ে-র কথা বলেছিলে আমায়···!

অম্লান বদনে এত কথা বলে হাতীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে আমার লজ্জা করছিল। হাতীরা ভারি সত্যবাদী হয়ে থাকে। এবং নিরামিষাশী তো বটেই, তাদের মতো সাধুপুরুষ দেখা যায় না প্রায়। ওর পদচ্যুতি ঘটিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি এই মিথ্যা কথায় কেবল বিরক্তি নয়, ও যেন রীতিমতো অপমান বোধ করছিল। এমন বিষ-নজরে তাকাচ্ছিল আমার দিকে যে—কী বলব! বলা বাহুল্য, তারপর আমি ওর ত্রিসীমানায় যাইনি।

হাতীরা সহজে ভোলে না।

———

শুঁড়-ওলা বাবা।

বই-টই গুছিয়ে নিয়ে বেরুবার উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে দাদামশাই ডেকে বল্লেন—আজ আর স্কুল যেতে হবে না। তোর শুঁড়-ওলা বাবা আস্‌চেন, দুপুরে এসে পৌঁছবেন, তার্ পেয়েচি। আজ আবার মেল্-ডে, আমার তো আপিস কামাই করা চলবে না। বাড়ী থাকবি তুই।

ইস্কুলে যেতে হবে না জেনে মণ্টুর ফুর্তি হল, কিন্তু সে বেশ ভাবনায় পড়ে গেল। শুড়-ওলা বাবা আবার কি রকম বাবা?

সে ত প্রায় বছর দশেক হতে চল্‌ল তার বাবা স্বর্গে গেছেন সে শুনেছে, তার কিছুদিন পরে মা-ও তার অনুসরণ করলেন। তখন থেকে মণ্টু মামার বাড়ীতেই মানুষ। এতদিন সে কোনো প্রকার বাবার সম্বন্ধেই কিছুমাত্র উচ্চবাচ্য শোনেনি, তবে অকস্মাৎ ওই শুড়-ওলা বাবার প্রাদুর্ভাব হোলো কোত্থেকে আবার?

বই-টই রেখে দিয়ে মণ্টু বৈঠকখানায় গিয়ে বস্‌ল এবং মনে মনে বাবার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে লাগল।

বাবা তাহলে দু'রকম? এক শুড় আছে, আরেক শুড় নেই। তবে সাধারণতঃ বাবাদের শুড় থাকে না। যথা নীতু, নীলিম ও ঝুন্‌কুর বাবার নেইকো! যে ক'টি বন্ধুর বাবার সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছে তাঁদের কারুরই শুড় নেই।

মণ্টুর মতে বাবাদের শুড় না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বাবারা যেমন ছেলেদের গাধা হওয়া পছন্দ করেন না, বাবাদের হাতী হওয়াটাও তেমনি ছেলেদের রুচিতে বাধে। তবে মণ্টুর দুর্ভাগ্য, বেচারার বাবাই নেই। আর সব বন্ধুর কেমন বাবা আছে, তারা বাবার কাছ থেকে কত কি প্রাইজ পায়, তবু তো সেদিন একটা সাইকেলই পেয়ে গেছে, কিন্তু বেচারা মণ্টু—।

যাক্, সৌভাগ্য বল্‌তে হবে যে এতদিন বাদে তবু মণ্টুর একজন বাবা আসচেন। তবে দুঃখের মধ্যে ঐ যা—শুড়! তার জন্যে আর কি করা

যায়, নেই মামার চেয়ে কানা মামা যেমন ভালো, তেমনি একেবারে বাবা না থাকার চেয়ে শুঁড়-ওলা বাবাই বা মন্দ কি? তারপর কাল আবার মণ্টুর জন্ম-দিন—হয়ত তিনি কেবল শুঁড় নাড়তে নাড়তেই আসছেন না, কত কি উপহারও ঝাড়তে আসচেন!

বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক মণ্টুদের বাড়ীর সামনে রিক্সা থেকে নামলেন এবং সোজা ভেতরে এসে জিগেস করলেন—এইটে ঘনশ্যামবাবুর বাড়ী না?

—হ্যাঁ।

—তাঁকে বলগে সত্যপ্রিয়বাবু এসেচেন। আমি সকালে তার্ করেচি, পেয়ে থাকবেন বোধ হয়।

তবে ইনিই! মণ্টুও প্রায় তাই আন্দাজ করেছিল। খুব মোটা বটেন, তবে হাতীর কাছাকাছি একেবারে নন্। তাছাড়া, শুঁড় নেই। শুঁড় না থাকার জন্য মণ্টু যে ক্ষুব্ধ হোলো তা নয়, বরং তাকে যেন একটু খুসিই দেখা গেল।

—দাদামশাই আপিস গেছেন। আপনি বসুন।

—তুমিই বুঝি উৎপল? আমি তোমার গুরুজন। প্রণাম কর। মণ্ট ঈষৎ হতভম্ভ হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কাকে?

—কেন, আমাকে? আশ্চর্য হবার কি আছে? গুরুজনদের ভক্তি করতে শিখবে, তাঁদের কথা শুনবে। এসব শেখনি?

মণ্টু হাত তুলে নমস্কার করল।

—ও কি? ও কি প্রণাম হলো? দেখচি এখানে তোমার শিক্ষাদীক্ষা সুবিধা হয়নি। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হয়। যাক্, ক্রমশঃ সব শিখবে। এখান থেকে গেলেই—

—আপনি কি আমাকে নিয়ে যাবেন এখান থেকে? কোথায়?

—কেন? দেশে। তোমার বাবার বাড়ীতে। আমাদের বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যেতেই ত আমি এসেচি।

আপনি আমার বাবা যদি তবে আপনার শুঁড় কই?

—শুঁড় ?

—হ্যাঁ। দাদামশাই যে বল্লেন যে মন্টু, তুই বাড়ী থাকিস, তোর শুঁড়-ওলা বাবা আজ আসবেন। কিন্তু আপনার শুঁড় নেইত! শুঁড় কোথায় ?

—হুঁ।

'হুঁ' বলে ভদ্রলোক ভারী গম্ভীর হয়ে গেলেন, মন্টুর সঙ্গে তারপর আর কোনো কথাই তাঁর হোলো না। ঘাট হয়ে গেছে ভেবে মন্টু ম্লান মুখে চুপ করে রইল। সে বইয়ে পড়েছিল বটে যে কাণাকে কাণা বলিয়ো না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না ইত্যাদি—পড়েছিল এবং মুখস্থ করেছিল, কিন্তু বইয়ের হুকুম কাজে না মান্‌লে যে অঘটন ঘট্‌বে তা সে ভাবেনি। যার পা নেই তাকে খোঁড়া বল্‌লে সে যেমন মনক্ষুণ্ণ হয়, এঁকে শুঁড় নেই বলাতে বোধহয় ইনি তেমনি বিচলিত হয়েছেন! অঙ্গহীনতার অনুযোগ না করাই মন্টুর উচিত ছিল।

ঘনশ্যামবাবু আফিস থেকে ফিরলে অন্যান্য কথাবার্তার পর সত্যপ্রিয়বাবু বললেন—দেখুন, উৎপলকে আমি নিয়ে যেতে চাই। দাদা বৌদি নেই, কিন্তু আমি ত আছি। আমিই এখন ওর অভিভাবক।

—কেন, এখানে তো ও বেশ আছে। সেই অজ্‌ পাড়াগাঁয়ে—

—তাহলে খুলেই বলি। এখানে ওর যথার্থ শিক্ষা হচ্ছে না।

—যথার্থ শিক্ষা বল্‌তে কি বোঝায় ?

—অনেক কিছু। তা নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার পক্ষে বাতুলতা। তবে এখানে থেকে যথার্থ অশিক্ষা যে ওর হচ্ছে তাতে ভুল নেই।

—যথার্থ অশিক্ষা হচ্ছে ? কি রকম শুনি।

—আপনি বলেচেন আমি নাকি ওর শুঁড়-ওলা বাবা। উৎপল তাই বলছিল। এতদ্বারা ওকে মিথ্যাবাদিতা শেখানো হচ্চে। আমি তো ওর বাবা নই, তাছাড়া আমার শুঁড়ও নেই।

—এই কথা! তুমি ওর কাকা তো বটে। 'ব'-এ শুঁড় দিলেই 'ক' হয় এও বোঝো না বাপু!

কিন্তু কিছুতেই সত্যপ্রিয়কে বোঝানো গেল না ; তারপর দিন সকালেই মণ্টুকে নিয়ে তিনি রওনা হলেন। পথে যেতে যেতেই মণ্টুর যথার্থ শিক্ষা সুরু হয়ে গেল।

—দেখ উৎপল ! আজ আমি তোমাকে মাত্র তিনটি উপদেশ দেব। যদি মানুষ হতে চাও তাহলে আমার এই তিনটি উপদেশ তোমার মূলমন্ত্র হবে আর জীবনে সর্বদা মেনে চলবে ! প্রথম হচ্চে, সত্যনিষ্ঠ হবে, সত্যের জন্য যে ত্যাগ, যে কষ্ট, যে লাঞ্ছনাই স্বীকার করতে হোক না কেন, কখনো পিছুবে না। দ্বিতীয় উপদেশ এই, সব সময়ে নিয়মানুবর্তী হবে। নিয়ম না মান্‌লে শৃঙ্খলা থাকে না, তাতে করে সামাজিক ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটে। আমার তৃতীয় উপদেশ হচ্ছে এই—

উপদেশগুলো মণ্টুর কানে যাচ্ছিল কিনা বলা যায় না, কানে গেলেও তার মানে নিশ্চয় তার মাথায় ঢোকেনি। একটু আগে একটি ছেলে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় অকারণে, বোধহয় অকারণ পুলকেই, মাথায় চাঁটি মেরে গেছল, কাকার নিয়ম-নিষ্ঠা প্রচারের মাঝখানে তার প্রতিশোধ নেবার সুযোগ সে খুঁজছিল। তৃতীয় উপদেশের সূত্রপাতেই, পথে চল্‌তি ছেলেটি আবার যেমনি তার পাশে এসেচে অমনি সে তাকে ল্যাং মেরে ধরাশায়ী করে ফেলল।

মণ্টু নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধি অনুসারে সম্ভবত নিয়মরক্ষাই করেছিল, কিন্তু সত্যপ্রিয় উল্‌টো বুঝলেন—গ্যাখো, এইমাত্র তুমি পথে চলার নিয়মভঙ্গ করলে।

—ও যে আমাকে চাঁটি মারল আগে !

—আমি তা দেখেচি, কিন্তু ওকে ক্ষমা করাই তোমার উচিত ছিল নাকি ? আমার তৃতীয় উপদেশ হচ্চে, কখনো কাউকে আঘাত করবে না। কেউ যদি তোমার বাঁ গালে চড় মারে তাকে ডান গাল ফিরিয়ে দেবে।

স্টেশনে গিয়ে সত্যপ্রিয় দারুণ ভাবনায় পড়লেন। মণ্টুকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি টিকিট কিনব ? হাফ্‌ না ফুল ? একটু মুশকিল আছে দেখ্‌চি।

—আমি তো হাফ্ টিকিটে যাই।

—বারো বছর পুরে গেলে পুরো ভাড়া দিতে হয়। আজ তোমার ঠিক বারো বছর পূর্ণ হবে। তবে হিসেব করে দেখলে ঠিক বারো বছরে পড়তে এখনো তোমার চার ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট তের সেকেণ্ড বাকি। তারপর থেকেই তোমার ফুল টিকিটের বয়স হবে।

—তা কেন? আমাদের পাড়ার হাব্‌লা দেখতে বেঁটে, কিন্তু তার বয়স সতের বছর। সে এখনো হাফ্-টিকিটে যায়, তাকে কই ধরে না তো।

—এতক্ষণ কি বোঝালাম তোমাকে? সর্বদা সত্যনিষ্ঠ হবে—বাক্যে, চিন্তায় এবং আচরণে। কাজেই এখনো যখন তোমার বারো বছর পূর্ণ হয়নি এখন ফুল-টিকিট কেনা যেতে পারে না কিন্তু গাড়ীতে যেতে যেতে পূর্ণ হবে, সেইটাই ভাবনার কথা। আচ্ছা তখনকার কথা তখন দেখা যাবে।

গাড়ীতে উঠে সত্যপ্রিয় একদৃষ্টে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। মণ্টু জানালার ফাঁকে বাইরের পৃথিবীর পরিচয় নিতে লাগ্‌ল।

কিন্তু যেই না চার ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট তের সেকেণ্ড গত হওয়া, অমনি সত্যপ্রিয়বাবু তাঁর বিপুল দেহ নিয়ে গাড়ীর য়্যালার্ম সিগ্‌নালের শেকল ধরে ঝুলে পড়লেন। ফল হোলো ঠিক মন্ত্রের মত—ঝড়ের বেগে যে-গাড়ী ছুটছিল, গাছপালাদের ছোটাচ্ছিল, দু'ধারের দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মধ্যখানে অকস্মাৎ তা থেমে গেল। ট্রেনের গার্ড এসে জিজ্ঞাসা করলেন কে শেকল টেনেছে?

সত্যপ্রিয় বুঝিয়ে বললেন—দেখুন, এই ছেলেটির বারো বছর এইমাত্র পূর্ণ হোলো। এর পর তো একে আর হাফ্ টিকিটে নিয়ে যেতে পারি না। কোনো স্টেশনে থামলেই ভালো হোতো, কিন্তু মাঠের মাঝখানে যে বয়স পূর্ণ হবে তা কি করে জানব বলুন! অসত্যকে প্রশ্রয় দিতে আমি অক্ষম, তা ছাড়া রেল কোম্পানীকে আমি ঠকাতে চাইনে। ওর হাফ্-টিকিট আছে। এখান থেকে পুরুলিয়া পর্যন্ত আরেকটা হাফ্-টিকিট আপনি দিন কিম্বা হাফ্-টিকিটের ভাড়া নিয়ে রসিদ দিন।

—এই জন্য গাড়ী থামিয়েছেন? আচ্ছা পরের স্টেশনে দেখা যাবে।

—তা দেখ্‌তে পারেন, কিন্তু ভাড়া এখান থেকে ধরতে হবে, পরের স্টেশন থেকে নিলে চলবে না।

পরের স্টেশনে গাড়ী থাম্‌তেই গার্ড সত্যপ্রিয়কে জানালেন যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েচে। তিনি আকাশ থেকে পড়ে বললেন—কেন, গ্রেপ্তার কিসের জন্য ?

—দেখ্‌চেন না, অকারণে শেকল টান্‌লে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা! স্পষ্টই লেখা রয়েছে। দরজার মাথায় ওই!

—অকারণে তো টানিনি।

—সে কথা আদালতে বল্‌বেন।

সত্যপ্রিয় কিছুতেই গাড়ী থেকে নাম্‌বেন না, সত্যের মর্যাদা রাখবার জন্য যা করা দরকার, যা প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ ভদ্রলোকই করবে, তাই তিনি করেচেন। তিনি তো কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করেননি, কারণ—গুরুতর কারণ ছিল বলেই শেকল টেনেচেন। কাজেই তিনি গ্রেপ্তার হতে নারাজ, এটা বেশ ওজস্বিনী ভাষায় সবাইকে জানিয়ে দিলেন।

তিনি নামতে প্রস্তুত নন, অথচ তিনি না নামলে ট্রেনও ছাড়তে পারে না। অনর্থক ডিটেন্ হতে হবে ভেবে সত্যপ্রিয়র সহযাত্রীরা গার্ডের সাহায্যে অগ্রসর হল। মাঠের মাঝখানে গাড়ী থামানোর জন্য তারা তখন থেকেই বিরক্ত হয়ে আছে। সকলে মিলে তাঁকে ধরে জোর করে নামাতে গেল। টানা-টানিতে সত্যপ্রিয়র দামী সিল্কের অমন পাঞ্জাবীটা গেল ছিঁড়ে; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মেজাজও গেল রুখে, তিনি ধাঁ করে একজন সহযাত্রীর নাকে ঘুসি মেরে বসলেন। তখন সকলে মিলে চাঁদা করে তাঁকে ইতস্ততঃ মারতে সুরু করে দিলে। কদাচ কাহাকেও আঘাত করিয়ো না—জীবনের এই মূলমন্ত্র তিনি ভুলে গেলেন। তবে, বাঁ গালে মার খাবার পর ডান গাল তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু সেটা বোধ হয় বাধ্য হয়ে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও, কেননা আক্রমণ থেকে এক গাল বাঁচাতে গিয়ে অন্য গাল বিপন্ন হচ্ছিল। অসুবিধা এই যে দুটো গাল এক সঙ্গে ফেরানো যায় না।

একা সত্যপ্রিয় কী করবেন? খানিকক্ষণ খণ্ডযুদ্ধের পরেই দেখা গেল যে একা তিনি সাত জনকে মারবার চেষ্টা করে কাউকেই বিশেষ মারতে পারেননি, কিন্তু সাত জনের মার তাঁকে হজম করতে হয়েচে। সকলে মিলে তাঁকে চাংদোলা করে স্টেশনের একটা গুদাম ঘরে নিয়ে ফেলে তার বাহির থেকে দরজা লাগিয়ে দিল—সেই যতক্ষণ না থানার থেকে পুলিশ এসে তাঁর হেফাজত নেয়। মণ্টু ও কাকার সঙ্গে স্বেচ্ছায় সেই ঘরে আটক রইল।

তারপর ট্রেন ছাড়ল। *স্টেশন জুড়ে ব্যস্ত উত্তেজনা, বিরাট সোরগোল,* সব সেই গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। ছোট্ট স্টেশনটা সত্যপ্রিয়র মত নির্জীব ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। সেই বদ্ধ ঘরের মধ্যে সত্যপ্রিয় ঘোঁৎ



ঘোঁৎ করতে লাগলেন। তাঁকে তখন আর চেনাই যায় না। সমস্ত মুখখানা ফুলে মস্ত হয়েচে, চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে, প্রকাণ্ড মুখে তাদের খুঁজেই পাওয়া যায় না—হ্যাঁ, এতক্ষণে হাতীর মাথার সঙ্গে তুলনা করা চলে। অচিরেই হয়ত শুড়ও বেরুতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে বলে মণ্টুর সন্দেহ হতে থাকে।

চ্যারিটির টিকিট

টিকিট কিন্‌তে কিন্‌তেই গেলাম! আজ জলসা, কাল কনসার্ট, পরশু মণিপুরী নৃত্য, তার পরদিন চ্যারিটি অভিনয়, এমনি একটা না একটা চলেছে তো চলেছেই, দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা, কামাই নেই, আর—(,) কমাও নেই। আর এসবের টিকিট না কিনেই কি নিস্তার আছে? টিকিট কিন্‌তে কিন্‌তেই ফতুর হয়ে গেলাম বলতে গেলে!

একটু আধটু লিখেটিখে এখান সেখান থেকে, একান্ত চেষ্টা চরিত্রে এক আধ টাকার টিকি দেখতে পাচ্ছি, টিকিটেই সাবাড় করে দিচ্ছে, দেখতে না দেখতে!

পরের হিতকল্পেই, অবশ্যি, ওসব। চ্যারিটির কারবার—টাকাটা ঘরে বেঁধে কেউ নিয়ে যাচ্ছে না। ধরে-বেঁধে সাধলেও না। হয় কোনো সমিতি, নয় কোনো সঙ্ঘ, অথবা কোনো মিশন, বা কারোর কন্যাদায় কিম্বা কোথাকার বন্যাদায়—এই সব ব্যাপারেই বলতে গেলে। অপরের উপকার করবার উপলক্ষেই এই সব আদায়, তাছাড়া আর কী?

নিজের অপকার করে পরের উপকার করা—এহেন উদ্দেশ্যের মহত্ব নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ আছে। যে সব বন্ধুরা চ্যারিটির টিকিট বেচতে আসেন, তাঁদের কথাই আমিই বলেছি।

কিন্তু আমার অভিমতকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই ধরেন না। স্পষ্টই বলে বসেন: 'তোমার মতের আবার মূল্য কি হে? তোমার মতামতে কিছু যায় আসে না।'

সত্যি আমার কথার কোন অর্থ হয় না সেটা আমি বুঝি। কিন্তু অর্থ ব্যয় হয় এই জন্যই ইতস্ততঃ করি।

তা তো যায় আসে না কিন্তু টাকাটা যায় কিনা!—আমতা আমতা করে বলি, তত্রাচ বলি।

'কিন্তু যাচ্ছে তো পরের জন্যই? পরের উপকারের জন্যই? লোকে

পরের জন্যে প্রাণ ছ্যায়। দিয়ে ফেলে নাকি ? তুমি তো একটা টিকিট কিনছ কেবল ! হয় পাঁচ টাকার, নয় দু টাকার, নয় এক টাকার ! বড় জোর না হয় একটা দশ টাকারই কিনবে ; এর বেশী তো নয় ?'

তা বটে !

এবং ভাবনার কথাই বটে ! বড় জোর একটা দশ টাকারই কিনবো —তার বেশী তো আর না !

'আচ্ছা নিজেকে পর ভাবলে হয় না ? ক্ষতি কি তাতে ?' পকেটের মধ্যে মণি ব্যাগ আঁকড়ে আমার সর্বশেষ প্রয়াস ঃ 'সে রকম ভাবলে, আমার টাকাটা—আই মিন পরের টাকার আর বাজে খরচ হয় না। পরের জিনিস বরবাদ হতে দেওয়া ভালো ? তুমিই বলো ?'

'নিজেকে পর ভাববে, তার মানে ?' বন্ধুবর একটু বিস্মিতই হন ! 'মানে নিজেকে পর ভেবে নিজের উপকারই করে ফেল্লাম না হয় ? পরকে আপনার ভাবতে দোষ কি ? তাই তো দস্তর।'

বন্ধু ভারী গোলমালে পড়ে যায়—'আপনার-পর এসব কী বকছ তুমি পাগলের মতো ?'

পাগলের মতোই বটে। জানি সাফল্য সুদূর পরাহত, তবু পরের তরফে প্রাণপণে ওকালতি চালিয়ে যাই, নিজেকে বাঁচাতে।

'নিজের মত পর কেউ আছে না কি হে ? অপরে মারা গেলে তবু আমরা কাঁদতে পাই, কাতর হয়ে পড়ি, শোক সভা করে থাকি—কিন্তু নিজের মৃত্যু শোক গায়েই লাগে না। নিজে মারা গেলে দুঃখই হয় না বলতে গেলে। তবে ?'

কিন্তু যাবতীয় জটিলতা কাটিয়ে উঠবার অসীম ক্ষমতা আমার বন্ধুদের। উক্ত নিদারুণ দার্শনিক সমস্যা সমূহে ধার ঘেঁষেও তাঁরা যান না—কিম্বা ধার ঘেঁষেও তাঁরা চলেন না—অবলীলাক্রমেই কেটে পড়েন বাস্তবিক !

'ওসব বাজে কথা রাখো ! টাকাটা বের করো দেখি বাপু ! এক কথাতেই সমস্ত কথা সাফ করে ছ্যান তাঁরা ! অগত্যা আত্মসংবরণ করে মনিব্যাগের মুখ ফাঁকা করতেই হয়। কিন্তু বন্ধুদের বেলা তবু রক্ষে ছিলো,

কম পক্ষে একটাকার কাটলেই কাটান ছিলো, তাই যা বাঁচোয়া, এবং পারলে পালাতে পারলে পালিয়েও পার পাওয়া যেতো, তাও কম কথা নয় ? কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আমাদের বিনিকে নিয়ে। বিনিও ঠিক না। বিনির কলেজের সহপাঠিনীরা—বিনি থেকেই যাদের সূত্রপাত বিনি সূতোয় সে সব বিভিন্ন ফুল গাঁথা পড়েছে তাদের নিয়েই বেধেছে ফ্যাসাদ।

তারাও আবার টিকিট গচাতে লেগে গেছে। তাদের হাত থেকে রেহাই নেই। এমন ফ্যাল ফ্যাল করে চায় আর ভ্যাল ভ্যাল করে হাসে—মুখের উপরেই হেসে ছ্যায়–যে উচ্চ বাচ্য না করে মুখটি বুজেই কিনতে হয়। দ্বিতীয় ভাগের অদ্বিতীয় গোপালের মতোই পাঁচ দশ টাকার নীচে নামবার যো কি! বেশী দামেরটাই কিনে ফেলি। বিনিকে তারা বলে ঃ কি করব বল ভাই! দাদারা কোন কাজের না। দামী টিকিটগুলো বেচতেই পারে না তারা এগুলো নিয়ে আমাকেই তাই বেরুতে হয়েছে। এক টাকার দু'টাকার—তাই কাটাতেই তাদের অস্থির কাণ্ড

দাদাদের সম্বন্ধে তাদের খেদোক্তি খুব খাঁটি বলেই মনে হয়!

'আমার দাদা কিন্তু টিকিট কিন্‌তে ওস্তাদ!' বিনি বলে ওঠে ঃ চ্যারিটি একটা হলেই হলো। প্রায় ফসকায় না।

দাদু-গর্বে বিনির বুক ফেঁপে ওঠে। আমি কিন্তু ভারী লজ্জিত হয়ে পড়ি। বিনি বলে ঃ 'আরো নতুন টিকিট পাস্ তো আনিস্ আরো। বুঝলি ?'

বুঝতে তাদের দেরী হয় না, ভয়ানক ঘাড় নেড়ে তারা চলে যায়।

ঘরে বোন থাকা, মানেই, দেখছি এখন বনে ঘর থাকা। অর্থাৎ যথারণ্যম্ তথা গৃহম্! অতএব অরণ্যে রোদন করে লাভ কী ? নিজের বোন কি আর ভাইয়ের দুঃখ বুঝবে ? পরের বোনরাই যখন বোঝে না!

কিন্তু ঘরে বাইরে এক রকম আক্রমণ কাঁহাতক সওয়া যায় ? ঘরোয়া বিভীষণতা থেকে বহুৎ ভেবে চিন্তে, বাঁচবার একটা ফিকির বার করি! অবশেষে! আর কিছু না, বিনির বন্ধুদের যখন অভ্যুদয়ের সময়, সেই দুর্যোগে বাড়ীতে না থাকা। সাধারণতঃ বিকেলের দিকটায়, কিংবা কলেজের ছুটিছাটা থাকলেই ওরা আসে—টিকিট কিম্বা বিনা টিকিটেই এসে পড়ে—

সেই ফাঁকটাই আমি রাস্তায় ঘুরে মরি। নেহাৎ অক্ষম হলে, চিলকোঠায় গিয়ে লুকিয়ে থাকি, বিনিরও অজান্তে।

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়েও কি নিস্তার আছে? কোলকাতার পথঘাট ভূগোলের গোলমালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমন অদ্ভুত ভাবে তৈরী যে একবার পা বাড়িয়েছ কি যত চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হতেও শুরু করেছে। এবং অচেনা অল্প চেনারাও খুব কসুর করছে না তা বলাই বাহুল্য।

যাকে তোমার জরুরী খুব দরকার এবং যাকে তোমার আদপেই প্রয়োজন নেই, তাদের দেখা পেতে হলে কোলকাতার পথে বারেক বেরুলেই হোলো। এমন কি, যখন তাদের কারুর দেখা না পাওয়াটাই বেশী দরকারী তখনো। সকলের মিলনের পক্ষে সুপ্রশস্ত, চলতি বৈঠকখানার সমতুল্য কলকাতার পথের সমকক্ষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কিছু আছে কি না সন্দেহ।

সত্যি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি দেখতে পাবে যাদের এক কালে চিনতে, এখন প্রায় ভুলে এসেছ যারা হয়তো কবে তোমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল, তারপর বহুদিনের ছাড়াছাড়ি, যাদের সঙ্গে সুদূর বিদেশে পরিচয়, প্রবাসের বাসি আলাপ যারা তোমার এক জেলার বা যাদের সঙ্গে এক সময়ে এক জেলেই কাটিয়েছিলে—অথবা যাদের চেনই না কোথাও একদা এক মিনিটের বাক্যবিনিময়—এমন কি বারম্বার বাড়ী চড়াও হয়ে হাঁকডাক দিয়েও যাদের পাত্তা পাওয়া যায় না, দেখতে পাবে, তাদের সবার সঙ্গে একে একে দেখা সাক্ষাৎ ঘটে যাচ্ছে। এবং—এবং প্রায় সবার হাতেই কোন না কোন চ্যারিটির টিকিট। অগত্যা কি আর করি রেগেমেগে একটা ছাপাখানাতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নিজেই শ'খানেক টিকিট ছাপাবো। ছাপিয়ে নেবো নিজের জন্যই।

জানা গেলো, একশ'খানা ছাপাতে যা খরচ তিনশ'খানা ছাপাতেও তাই—তখন বেশী ছাপানোই সুবিধে। অতএব পাঁচ টাকা দামের কমলা রঙের ছাপালাম একশ'। দু'টাকিয়া লাল রঙের শ'খানেক বাকিটা বাদামী। আরো দামী আর ছাপালুম না মেরেকেটে পাঁচ-টাকা তক্ হয়তো কাটাতে

পারবো—বেশী দামের ছেপে কি হবে? তা ছাড়া দশ টাকার টিকিট মেয়েরা বেচতে পারে। আর—আর আমি তো আর মেয়ে নই।

তিনশ' টিকিট দু'খানা বইয়ে বাঁধিয়ে চমৎকার বানিয়ে বার করে দিলে তারা। সেই ছাপাখানাওয়ালারা।

রঙ-বেরঙের টিকিটগুলোর দিকে তাকাই আর পুলকে গুমরে গুমরে উঠি। পাতায় পাতায় ঝকঝকে হরফে জ্বল জ্বল করছে :

H, R, K, R,-এর সাহায্যকল্পে বিখ্যাত জাতিস্মর বালক রামখেলন তবলা বাজাইবেন এবং ধ্রুপদ গাহিবেন।

ষ্টার থিয়েটার—আগামী শনিবার।

বাস্, আর আমাকে পায় কে! রাস্তার বন্ধুবান্ধব দেখলেই পাকড়াও করি; যে এককালে টিকিট গচিয়ে গেছে তাকেও। এবং যে কখনো সে দুষ্কর্ম করেনি তাকেও—কাউকে বাদ দিই না।

এবং যে পুনরায় নতুন টিকিট গচাতে এসেছে, তার বেলা তো কথাই নেই! কিনবো বই কি ভাই! টিকিট না কিনলে হয়!—দেখবামাত্রই বলতে শুরু করি: চ্যারিটির ব্যাপার—কিনতে হবে বৈকি? ক'খানা দেবে বলো তো? কতো দামের দিতে চাও? তার বদলে তত দামের এচ, আর, কে, আর-এর, টিকিটগুলো দেবো তোমায়—এই বেচেই টাকাটা তুলে নিয়ো, কেমন?

শোনামাত্রই বন্ধুরা পেছোতে থাকেন: এই বলে বিক্রি করে পেরে উঠছিনে। এর উপরে আবার? আঁৎকে ওঠেন তাঁরা, আঁতে গিয়ে যেন ঘা লাগে তাঁদের!

ক্ষতি কি? একই কথা তো। টিকিট নিয়ে টাকা দিতাম তার বদলে এই টিকিটগুলোই দিলাম না হয়। ঠিক তত দামের ততখানাই দেব, বেশী দিচ্ছি না তো। ভড়কাচ্ছ কেন? খুব বেচতে পারবে একখানা!

না ভাই, পেরে উঠবো না ভাই! তারা কাঁদো কাঁদো হয়ে পড়ে: যা কাছে রয়েছে তার ধাক্কাই সামলাতে পারছি নে! কী যে বলো! তোমরা আবার পারবে না! তোমরা না পারো কী! তোমাদের আবার অসাধ্য

আছে ? এ তো বোঝার উপর শাকের আঁটি। নাও, কতো দামের দেবো বলো ? দু'টাকা—এক টাকা না পাঁচ টাকা ?

সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের উদ্দীপনা কমতে থাকে। দেখতে দেখতে, কে যে কোন ফাঁকে কোথা দিয়ে সরে পড়ে টেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু আমিও সহজ পাত্র নই। আরো সব বন্ধুদের বাড়ী গিয়ে চড়াও হই। ফলাও করে টিকিট বেচতে লেগে যাই।

কিন্তু কি আশ্চর্য, একাদিক্রমে বন্ধুদের সকলের সমান বীতস্পৃহা সম্পূর্ণ অপারক, টিকিট কেনা সবার পক্ষেই সুদূরপরাহত। কারো বৌয়ের অসুখ, কারু বা ছেলেমেয়ে হোয়েছে—হামাগুড়ি নয়, হামের গুড়ি দেখা দিয়েছে। কারো অন্য কোথাও ঠিক সে দিনই নেমতন্ন, কেউ বা ছোট ছেলেপিলেদের থিয়েটারে নামানোর ঘোর বিরোধী, কোথাও বা রামখেলন বলেই যত আপত্তি, কারো ধ্রুপদ গানে আসক্তি নেই, বরং ভয়ই রয়েছে দস্তুর মতো, কোনো বন্ধুর তো তবলার বোল শুনলেই তবলায় নয়, তার নিজের মাথাতেই কে যেন চাঁটাতে থাকে। ইত্যাদি, ইত্যাদি—।

একজন তো স্পষ্টই বলে বসল ঃ ওসব জন্মান্তরবাদে, ভাই আমারই বিশ্বাসই নেই। জাতিস্মর না বজ্জাতিস্মর।

এচ্. আর কে. আর-এ উদ্দেশ্যের কিছু জানো তুমি ? আমি প্রশ্ন করি, বেশ বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করি।

কে আর না জানে ! সবাই জানে ওদের ব্যাপার। তুমিই কি আর জানো না ? তুমিই বলো না।

তা বটে ! আমার তো অজানা থাকবার কথা নয়—আমিই যখন টিকিট হস্তে বেরিয়েছি। আমাকে বলতে হয় ঃ না ভাই, তোমার ভুল ধারণা। ওদের উদ্দেশ্য মহৎ। অ্যাপেণ্ডিসাটিইস জানো তো ? কি সাংঘাতিক ব্যারাম ! তাই সারানোর মৎলবেই এই সমিতিটা খোলা হয়েছে। বুঝেছ ! একটা নতুন পদ্ধতির চিকিৎসাকেন্দ্র—

জানি। জানি ! আর বলতে হবে না ! কে না জানে ! কিন্তু ওসব ব্যামো আমার হোলে তো।

এরপর আর কথা চলে না। মুখ না চালিয়ে পা-ই চালাতে হয়।

অবিক্রীত বাঁধানো টিকিটের খাতা বগলে' অম্লান বদনে বাড়ী ফিরে আসি। শেষটায় আমিও যে টিকিট বেচার দলে ভিড়ে গেছি ক্রমে ক্রমে বন্ধুরা জেনে গেলো সবাই। তারপর থেকে বেচারাদের আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। কোথায় যে তারা উধাও হোলো, কোন লোপাটকায় গিয়ে গুম হয়ে বসে রইল কে বলবে? আর আমার বাড়ী বয়েও আসে না, তাদের বাড়ী গিয়েও ডেকে হেঁকে সাড়া মেলে না। আর পথে ঘাটে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলে, দাঁড়ায় না একদণ্ড, হ্যাঁ-না করতেই পা বাড়িয়ে বসে আছে! হোলো কি সবার। কারো আর টিকিটিও দেখা যায় না, টিকিটও না।

এমন কি বিনির বন্ধুরাও ক্রমশঃ বিরল হয়ে এলো। আমার টেবিলের উপর টিকিটের আধিপত্য দেখেই কিনা কে জানে!

আমিও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।

এক হপ্তাও কাটেনি, ছাপাখানার সৌজন্যে। এচ. আর. কে. আর-এর কৃপায় এবং অবিশ্ববিশ্রুত রামখেলনের রামলীলার দৌলতে, ক'দিনের মধ্যেই আমার জীবনে যেন মিরাকল ঘটে গেলো।

একদিন প্রাণান্ত চেষ্টায়ও একখানা টিকিটও বেচতে পারিনি, আনন্দেই আছি এ সপ্তাহে, বোধ হয় জীবনে এই প্রথম পকেটটাও একটু যেন ভার ভার ঠেকছে—টাকাকড়ির বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছে যৎকিঞ্চিৎ। অতএব শুক্রবার সারাটা দিন টো টো করে ঘুরলাম সিনেমায় সিনেমায়—তিনটার, ছটার শোয়ে পকেট হাল্কা করতে লাগলাম উঠে পড়ে—

বারোটা বাজিয়ে বাড়ী ফিরলাম—সোজা নিজের বিছানায়।

পরের সুপ্রভাতে, শনিবার সকালে ঘুম ভেঙ্গে টেবিলের দিকে তাকাতেই তো আমার চক্ষুস্থির!

বাঁধানো খাতাটা সেখানে নেই।

অ্যাঁ? ওখানে যে টিকিটগুলো ছিলো গেলো কোথায়—? তৎক্ষণাৎ হাঁক ডাক লাগিয়ে দিই: কে নিলে? বিনি! বিনি! এই বিনি।

চোটপাট লাগিয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ।

কেউ টেনেটুনে ফেলে দিলে না তো! পাড়ার ছেলেপিলেদের কেউ? কী হাঙ্গামা বলতো। ওগুলো যে ওখানেই থাকবে—ঐ টেবিলেই, মৌরসী পাট্টার মতো—মহাসমারোহে চিরদিন ধরেই বিরাজ করবে! ওরা গেছে কি আমিও গেছি। কী সর্বনাশ।

গর্বিত পদক্ষেপে বিনির প্রবেশ হয়ঃ 'কী? হয়েছে কী? এত সকালে চেঁচামেচি কেন?'

'আমার টিকিটগুলো দেখছি না যে। কে নিলে?'

কে আবার নেবে? 'আমি বেচে দিয়েছি!'

'বেচে দিয়েছিস্! বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হয়।'

'বাঃ, কাল সারাদিন ধরে তো ঐ করলাম কেবল?' বিনি চোখ মুখ ঘুরিয়েই বলে ঃ 'সেল করলাম সবগুলো!'

'অ্যাঁ!—বলিস্ কী তুই? বিছানার উপরেই বসে পড়ি।

'আজ শনিবার ওদের চ্যারিটি, অথচ দেখলাম, একখানাও তুমি বেচতে পারোনি, বুঝলাম ও তোমার কর্ম নয়। আমাকেই তাই বেরিয়ে পড়তে হলো। চ্যারিটির কাজ তো সাফার করতে পারে না সবগুলো সেল করে তবেই কাল ফিরেছি কী আর করবো?'

'অ্যাঁ—বলিস্ কিরে?' আমি তাজ্জব হয়ে যাই। সবগুলোই!

'ও আর শক্ত কি এমন! আমাদের মেয়েদের কাছে ও তো কিছুই না—জলের মতো সহজ! যার কাছে নিয়ে যাই সেই কিনে ফ্যালে হাসিমুখেই। অম্লান বদনেই কেনে! দশ টাকা দামের থাকলে তাও বেচে দিতাম। তাও খুঁজছিলো অনেকে!'

'কাদের কাছে বেচলি? আমার বিস্ময় বেড়েই চলে আরো।'

'বন্ধুদের দাদাদের থেকে শুরু করলাম। বাড়ী বাড়ী সারা করে তারপর গেলাম কলেজে। প্রফেসারদের গছালাম সব। ছেলেরাও কিনলে বিস্তর। তাদের দিয়ে থুয়ে সোজা গেলাম কর্পোরেশনে—কাউন্সিলার, মেয়র, মেয়রস—কাউকে বাদ দিই নি। তারপর কাগজগুলোর অফিসে ঢুঁ মারলাম, বাদবাকী সব সেখানেই খতম। এডিটর, সাব-এডিটর, প্রুফ

রীডার, কম্পোজিটার, প্রেসম্যান পর্যন্ত কাড়াকাড়ি করে কিনে ফেললে সকলে! তিনশ' টিকিট কাটাতে আর কতক্ষণ?'

'তা বটে!' দম নিয়ে বলি : 'কিন্তু কিনিলো তারা সবাই? একটুও কাঁচুমাচু না করে? একেবারে অম্লান বদনে? মুখ চুন না করে টু শব্দটি না করেই কিনলো?'

'আদর্শ লক্ষ্মীছেলের মতো। ঠিক তুমি যেমন কিনে থাকো। বিনীত দুর্বিনীত জবাব 'কেন, কিনবে না কেন? কী হয়েছে! তুমিই কেবল কিনতে জানো নাকি?'

'না না, তা বলছি না, তবে কি না—বাচ্ছা রামখেলনের তবলা শুনতে রাজি হোলো মানুষ? আপত্তি করলো না কেউ?'

'কেউ কেউ বলছিলো বটে যে, তবলার বদলে নাচের জলসা হলেই ভালো হোত, কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিলুম, রামখেলনের জন্য নয়, এচ, আর, কে. আর-এর বেনিফিটের জন্যই চ্যারিটিটা হচ্ছে কিনা। অমনি তারা সমঝে গেল ঠিক।'

'ও! এচ্. আর. কে আর! তা বটে!'

'ভালো কথা, এচ্. আর. কে. আর-টা কী দাদা?'

'ও একটা জাপানী সিসটেম্ পেটের ব্যারাম সারানোর। হারিকিরি। হারিকিরি নাম শুনেছিস্ তো? সংক্ষেপে এচ্. আর. কে. আর।'

'হা-রি-কি-রি। অদ্ভুত তো। তা তোমার ঐ ড্রয়ারের মধ্যে রয়েছে হারিকিনির টাকা আটশোর কিছু কম, গোটা কয়েক ট্যাক্সি ভাড়ায় গেছে কিনা।'

ড্রয়ার টেনে দেখলাম, রুমালে জড়ানো নোটে, টাকায়, আধুলিতে সিকিতে গাদা।

'হারিকিনিওয়ালাদের টাকাটা দিয়ে এসো গো দাদা। আজই তো শনিবার—দেরী আর কই, 'ক' ঘণ্টা বা আছে? হ্যাঁ, জান দাদা, একজন সায়েবকেও খানকতক টিকিট কিনিয়েছি। সায়েব হলো তো কী, গছিয়ে দিলাম, ছাড়বো কেন?

'সায়েব! সায়েব আবার পেলি কোথায়?' এবার আমি বিস্ময়ের মগডালে উঠি।

'মেয়রের চেম্বারেই ছিলেন। যে সে সায়েব নয়, জাঁদরেল একজন পুলিশ কমিশনার সায়েব!' বিনির মুখে বিজয়িনীর হাসি।

'তাহলে—তাহলে—হারিকিরি ঠিকই হয়েছে—'

পরমুহূর্তেই তৃণহীন অগাধ জলে তলিয়ে যেতে যেতে, স্খলিত কণ্ঠে আমি বলি ঃ 'তাহলে আর দেরী করা চলে না। বেরিয়ে পড়তে হয় এক্ষুণি বাস্তবিক!'

শনিবার সকালেই যেন শনিবারের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে—চারিদিকে অন্ধকার দেখি। কোথায় বা রামখেলন কোথায় বা আমি! আর বিলম্ব নয়। এখনি কেটে পড়তে হবে এই শহর থেকে। এর ত্রিসীমানা থেকে —বিপ্লব বাঁধবার আগেই, সোরগোল জাগতেই সটকে পড়তে হবে কোথাও। দিল্লী কিংবা ডিব্রুগড় রাচী কিম্বা করাচী, গৌহাটি কি গোঁদলপাড়া কোথাও গিয়ে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে হবে—পুলিশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার পরোয়া না থাকে। হারিকিরির কিরি পর্যন্ত না এগুতে পারি। অন্ততঃ হারি আর না করলেই নয়! বিনির হাসির বিনিময়ে আমি ঠিক হাসতে পারি না।

———

মামির বাড়ির আবদার

'রাণাঘাট যাবে বলেছিলে, কখন বেরুবে?' গোবর্ধন এসে দাদাকে শুধালো : 'মামার বাড়ী যাবে না, আজকে?'

'যাবোই তো! জবাব দিলেন হর্ষবর্ধন : যা, তোর বৌদির কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে আয়, ট্রেন ভাড়া লাগবে না?'

গোবরা ছুটলো বৌদির কাছে। হর্ষবর্ধন পেছন থেকে হাঁক দিলেন—'তোর বৌদিকে তৈরী হতে বল। সেজেগুজে তৈরী হয়ে নিক, বুঝলি?

গোবরা একখানা একশো টাকার নোট নিয়ে ফিরে আসে—'এতে কুলোবে? জিগ্যেস করছে বৌদি।

'ঢের ঢের। জানালেন দাদা : 'আমার কাছেও তো খুচরো কিছু রয়েছে। তাতেই ট্যাক্‌সি ভাড়া হবে। চাইকি—বলে একটু মুচকি হাসলেন হর্ষবর্ধন—'এই ফাঁকে এই টাকাতেই তোদের মামির বাড়িও ঘুরিয়ে আনতে পারি।

'মামির বাড়ি? গোবরা শুনে তো অবাক : মামির বাড়ি কি আবার আলাদা জায়গায় নাকি?

'মামি দেখেছিস কখনো?

'দেখবো না কেন? মামার সঙ্গেই দেখেছি মামিকে। এক জোড়া মামা মামিকে একসঙ্গে! একবার নয়, অনেকবার।

'আরে, সে মামি নয় রে, মুখ্য। এ হচ্ছে সেই মামি, যে মামির মামা নেই। মামা হয় না।

'যাঃ, তা কি কখনো হতে পারে? গোবরার বিশ্বাস হয় না মামারা হচ্ছে কবিদের মতোই বর্‌ন (Born)! যেমন কিনা হয়ে থাকে বর্‌ন পোয়েট। মামাজ্‌ আর বর্‌ন, বাট মামিজ্‌ আর মেড। 'মায়ের ভাই হয়ে জন্মাতে পারলেই মামা হয়, কিন্তু অনেক ঘটা করে মামিদের আনতে

হয়। মামা বিয়ে করলে তবেই হয় মামি। মামাকে যে বিয়ে করে সেই হচ্ছে মামি। মামি কিন্তু দাঁতের মতো আপনার থেকে গজায় না।'

'আরে, সে মামি নয় রে, সে মামি নয়। মিশরের মমি।'

'মিশর আবার কে ? শুনিনি তো। মিশর কোন্ মামা গো ?'

'মিশর আমাদের কোনো মামা নয়। জাদুঘরে থাকে যে মিশরের মমি, সে-ই মমি—আজ তোদের দেখিয়ে আনবো, চ। মামির বাড়ি হয়ে তারপরে মামার বাড়ি যাবো।'

জাদুঘরে গিয়ে ম মি দেখে তো গোবরার বৌদি, হতবাক—'ওমা, এই তোমার মামার ছিরি! এই তোমার মিশরের মামি ?'

'মড়া যে। অনেকদিন আগেই মারা গেছে। মারা গেলে কি আর চেহারা থাকে ?' হর্ষবর্ধন বলেন ; 'ওষুধ লাগিয়ে এমন রেখেছে।'

'বাসি-মড়া—তাই বলো। রীতিমতন বাসি-মড়া।'

মামির কফিনের গায়ে একটা টিকিট লাগানো ছিলো, তাতে লেখা—B. C. 2299 ; গোবরা সেই দিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—'এটা কি দাদা ? কিসের নম্বর !'

দাদারও চোখে পড়েছিলো সেটা। তিনি মাথা নেড়ে বললেন—'এটা আর বুঝতে পারছিস নে হাঁদা!' বুঝিয়ে দেন দাদা : 'যে মোটরচাপা পড়ে মেয়েটা মরেছিলো, এটা সেই গাড়ির নম্বর।'

'আহা-হা! মোটরচাপা পড়ে মারা গেলো, মেয়েটা।' শ্রীমতী হর্ষবর্ধনের শুনে দুঃখ হয় : 'এই জন্যেই বলি তোমাদের—সাবধানে চারধারে দেখে—হুঁসিয়ার হয়ে পথ চলতে। তা কি তোমরা আমার কথা শুনবে ? এখন, এই দেখে যদি শিক্ষা হয় তাহলেও বাঁচি।'

'হেঁ হেঁ, আমায় আর কোনো মোটরকে চাপা দিতে হয় না। কথাটা হেসেই উড়িয়ে দেন হর্ষবর্ধন : 'বপুখানা দেখেছো তো ? কোনো মোটর ভুলে আমার সঙ্গে লড়তে এলে নিজেই উল্‌টে পড়বেন'—বলে হাসতে হাসতে হর্ষবর্ধন একটা সিগ্রেট ধরালেন।

'কোনো লরী ? গোবর্ধন জানতে চায় : 'লরী আসে যদি ?

'লরী ? লরীর সঙ্গে লড়ালড়িতে বোধ হয় আমি পারবো না।

এমন সময়ে জাদুঘরের এক কর্মচারী এসে বললো 'মশাই, সিগ্রেটটা নিবিয়ে ফেলুন, আপনার।'

'কেন বলুন তো! নিজের পয়সায় খাচ্ছি। আপনার পয়সায় নয়। হর্ষবর্ধন বলেনঃ 'মামার বাড়ির, আই মীন; মামির বাড়ির আবদার নাকি ?'

'হ্যাঁ মশাই, তাই। কর্মচারীটি জানান—'মমির ঘরে সিগ্রেট খাওয়া নিষেধ।'

'কেন, খেলে কি হয় ?' গোবরা জানতে চায়।

'জরিমানা হয়। পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। সামনেই তো নোটিশ ঝুলছে—দেখছেন না ?'

সত্যিই তাই। নোটিশঃ 'সিগ্রেট খাওয়া দণ্ডনীয়। এখানে সিগ্রেট টানিলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইবে।'

'নেবানো তো যায় না, সবে ধরিয়েছি মাত্তর। দুটানও টানিনি এখনও। হর্ষবর্ধন বলেনঃ 'এই নিন আপনার জরিমানা!' একশো টাকার নোটখানা ভদ্রলোকের হাতে দেন।

'আমার কাছে তো ভাঙানি নেই!' কর্মচারী বলেনঃ 'পঞ্চাশ টাকা এখন পাই কোথায় ?'

'তাহলে কী হবে!' ভদ্রলোকের হয়ে হর্ষবর্ধনই ভাবিত হনঃ 'তাই তো, কোথায় উনি পাবেন এখন পঞ্চাশ টাকা ? গোবরা, তুইও ধরা না হয় একটা। তাহলে ডবল জরিমানা হয়ে ওটার পুরো টাকাটাই কেটে যাবে এখন।'

'কী যে বলো তুমি, দাদা!' শ্রীমান গোবর্ধন ব্রীড়াবনত হয়ঃ 'তোমরা হলে গুরুজন। তোমাদের সামনে আমি কখনো সিগ্রেট টানতে পারি ? আড়াল হলে না হয়—'

'তাহলে তুমিই এক টান টানো না হয়, গিন্নী! টেনে ছাখো না একবার।'

'মরণ আর কি।' হর্ষবর্ধনের বৌ-এর মুখ ব্যাজার হয়।

'তবে আর কি হবে? আপনিই একটা সিগ্রেট ধরান তাহলে—' এই বলে নোটখানা আর একটা সিগ্রেট ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বৌ আর ভাইকে নিয়ে হর্ষবর্ধন বাইরে এসে ট্যাক্সিতে চাপেন।

'শিয়ালদা ষ্টেশনে পৌঁছে তাঁর খেয়াল হয়। ঐ যাঃ আমাদের ট্রেন ভাড়ার টাকা কই? টাকা যা ছিলো তা তো জাদুঘরেই খুইয়ে এসেছি—মামির বাড়ির আবদার রাখতেই গেছে একশো টাকা। এখন কি হবে, তিনখানা রাণাঘাটের টিকিটের দাম সতেরো টাকা সাত আনা—এখন পাই কোথায়? গোবরা, তোর কাছে কিছু আছে নাকি? গিন্নী, তোমার কাছে?'

'ওমা, আমি কোথায় পাবো?' গিন্নী বলেন। 'আমার ট্যাঁকে কি টাকা থাকে? আমার ট্যাঁক আছে নাকি!

'তবেই তো মুস্কিল। হর্ষবর্ধন মাথা চুলকোন।

'বাড়ি ফিরে যাই দাদা!' গোবরা বাৎলায়।

'পাগল হয়েছিস? মামার বাড়ির জন্যে পা বাড়িয়ে ফিরে যাবো—বলিস কিরে? একবার সেখানে গিয়ে পড়তে পারলে হয়। তখন মামার কাছে চাইলেই হবে। ফিরতি ভাড়ার জন্যে ভাবনা নেই।

'মামার বাড়ির আবদার—বলেই দিয়েছে।' গোবরা বলে দেয়। 'কিন্তু সমস্যা—এখন যাই কি করে? গিয়ে পৌঁছুই কি করে আমার কাছে খুচরো যা আছে'—হর্ষবর্ধন এ পকেট ও পকেট হাতড়ে কুড়িয়ে বাড়িয়ে দেখেন—'তাতে কুললে একটা হাফ টিকিট হয়, তার বেশি হয় না। যাক্, ওই হাফ টিকিটেই হবে। একখানা হাফ টিকিটেই হয়ে যাবে।'

'তুমি বলো কি গো?' হর্ষবর্ধনের বৌ আপত্তির সুর তোলে ঃ তিনজন সোমত্ত মানুষ—একটা হাফ টিকিটে যাবো আমরা?

'তা কি কখনো হয় দাদা?' গোবরাও গাঁই-গুঁই করে।

'হয় বই কি। অঙ্কের মাথা থাকলেই হয়। অঙ্কের জোরেই যাওয়া যায়।'

এই বলে হর্ষবর্ধন কথা আর না বাড়িয়ে রাণাঘাটে থার্ড ক্লাসের একটা হাফ টিকিট কিনে আনেন—'একবার তো মামার বাড়ি গিয়ে পড়ি কোন রকমে, তারপর দেখা যাবে। ফিরবো দেখিস ফার্স্ট কেলাসে।'

রাণাঘাট লোকাল—প্লাটফর্মে ছিলো! একটা খালি কামরা দেখে তারা উঠলেন। উঠে বসলেন বেঞ্চিতে।

হর্ষবর্ধন বললেন—'তোমরা বেঞ্চির ওপরে বোসো না যেন। তলায় ঢুকে যাও, বুঝলে? কেবল আমি একলা বেঞ্চির ওপর বসি।

'কেন? তুমি কি লাটসাহেব?

'আবার জিগ্যেস করে, কেন? টিকিট কই তোমাদের? এক্ষুনি চেকার আসবে, বিনা টিকিটে যাচ্ছো দেখলে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দেবে তখন। যাও, ঢুকে পড়ো চট করে। তুইও সেঁধিয়ে যা গোবরা।

জেলের ভয় দেখিয়ে ভাই আর বৌকে তিনি বেঞ্চের তলায় ঠেলে দেন। নিজে বসেন বেঞ্চির ওপরে গ্যাঁট হয়ে। গাড়িও ছেড়ে দেয়।

কয়েক ষ্টেশন যেতে না যেতেই পাশের কামরা পেরিয়ে চলতি গাড়িতেই চেকার এসে ওঠে—টিকিট দেখি।

হর্ষবর্ধন টিকিট দেখান।

'হাফ টিকিট—একি?' চেকার তো অবাক: 'এতো বড়ো বুড়ো ধাড়ি হয়ে হাফ টিকিটে যাচ্ছেন—সে কি মশাই?'

'কেন যাবো না? হর্ষবর্ধন প্রতিবাদ করেন: 'অঙ্কের জোরেই তো যাচ্ছি।'

'অঙ্কের জোরে, সে আবার কি? বুঝতে পারলাম না তো।

'অঙ্কের মাথা থাকলে তো বুঝবেন? বেঞ্চির তলায় একবার তাকিয়ে দেখুন, বুঝবেন তাহলে।'

চেকার বেঞ্চির তলায় চোখ চালায়—সেখানে আরো দুজন গাদাগাদি হয়ে বসে রয়েছে দেখতে পান। ঠিক বসে নয়—শোয়া বসার মাঝামাঝি অবস্থায় ঠাসাঠাসি হয়ে ঘাড় হেঁট করে।

'এখানে এমন করে বসে কেন? টিকিট আপনাদের।'

'টিকিট নেই তো। গোবর্ধন কাতরস্বরে বলেঃ 'টিকিট নেই আমাদের।'

ওপরে হাফ টিকিট, নীচে একেবারে টিকিট নেই—ভারী তাজ্জব ব্যাপার! টিকিট চেকার তো থ—বিনা টিকিটে যাচ্ছেন যে বড়ো?'

'বিনা টিকিটে কেন? এই তো টিকিট রয়েছে। আমার হাতেই আছে, দেখছেন না?' হর্ষবর্ধন দেখানঃ এতোক্ষণ তাহলে কী দেখছেন মশাই, আপনি!

'ও তো হাফ টিকিট। ওই টিকিটেই তিনজনা যাচ্ছেন নাকি?'

'যাচ্ছিই তো, 'অঙ্কের জোরেই যাচ্ছি।' হর্ষবর্ধন এক কথা—'আলবৎ যাচ্ছি।'

'মামার বাড়ির আবদার নাকি?' চেকার নিজেকে আর চেক করতে পারেন না, গর্জে ওঠেন।

'মামার বাড়ির বলতে পারেন, বরং।' গোবর্ধন তলার থেকে কঁই-কঁই করে—বেঞ্চের সঙ্গে লেপটে থেকে—'মামার বাড়ির আবদার তো পরের কথা, সেখানে গিয়ে হবে।'

'বলি মশাই, হর্ষবর্ধন বলেনঃ একের তলাই দুই থাকলে কী হয়, তা জানেন না? তিন হয়, না, হাফ হয়? মাথা মাটি করে কোন দিন ম্যাথামাটিক্স শেখেন নি ইস্কুলে? একের তলায় দুই থাকলে হাফ হবে—অঙ্কের এই নিয়ম। বেঞ্চির ওপরে একলা চিরকাল আমি, বেঞ্চির তলায় দুজন—হাফই তো হবে। হাফ টিকিটেই তো যাবো আমরা। এই বলে হর্ষবর্ধন হাঁফ ছাড়েন। ট্রেনও রাণাঘাটে এসে হাঁফাতে থাকে।

———

শাল-দোশালার কাণ্ড

সেদিন সকাল হতেই সদরে কে কড়া নাড়তে শুরু করেছে। ভারি খটাখট লাগিয়ে দিয়েছে তখন থেকে।

অনেকক্ষণ সুরমাধুরী উপভোগের পর হর্ষবর্ধন বিচলিত হয়ে গোবর্ধনকে আদেশ করেছেন অবশেষে : 'ছাখ তো রে! কার এমন কড়া আওয়াজ! ছাখ তো!

দাদার হুকুমের ওয়াস্তাই ছিলো গোবরার। নীচে ছুটে গিয়ে তক্ষুনি সে ফিরে এসেছে রুদ্ধ নিশ্বাসে : শাল বেচতে এসেছে একজন।

'বটে? শুনেই গুম্ হয়ে গেছেন হর্ষবর্ধন।

'ডাকবো তাকে? দাদার উচ্চবাচ্যের অপেক্ষা করে গোবরা।

'ডাকবি? দূর পাগল! ভাগিয়ে দে, এক্ষুনি ভাগিয়ে দে! হর্ষবর্ধন ঠিক হৃষ্ট হতে পারেন নি : আক্কেল ছাখো মানুষের! কামারশালে এসেছে ছুঁচ বেচতে। ছুঁচ বিক্রি করার জায়গা পায়নি। বলে আমাদেরই কতো শালের জঙ্গল—আমরা কেটে উড়িয়ে দিলাম, কত শাল গাছ উই ধরে খেয়ে গেলো অমনি—আর আমরা কিনা কিনতে যাবো শাল। আচ্ছা উজবুক তো কলকাতার লোকগুলো!'

'সে গেছো শাল নয় গো দাদা?' গোবরা প্রতিবাদ করে : 'মাথায় করে বেচতে এনেছে, বলছি!—'

'আচ্ছা, গেছো-শাল না হোক—কেঠোশাল! ও একই কথা! শাল গাছকেই চেলা করে তক্তা বানিয়ে শাল কাঠ হয়! না তো 'কি আকাশ থেকে পড়ে নাকি? ও আর এমন কী হাতী-ঘোড়া যে, পয়সা খসিয়ে কিনতে হবে?'

'সে-শাল নয়—সেদিক দিয়েই নয়! গোবরা এবার অনাবৃত করে : 'শালের কাপড় নিয়ে এসেছে, বেচতে!'

এতোক্ষণ শাল গাছের উত্তুঙ্গ উচ্চতায় বিরাজ করছিলেন, সেখান থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে পড়ে গিয়ে হর্ষবর্ধনের বাকশক্তি লোপ পায়!

'শালের কাপড়!' বলে কি! অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে খুঁজে পান আবার: 'পাটের কাপড়ই তো হয় শুনেছি! পাটের নাকি গাছও আছে শোনা গেছে। কিন্তু শাল কাঠ থেকে কাপড়! য়্যা। দেখছি, সত্যিই তাহলে বিজ্ঞানের বাহাদুরী আছে বলতে হবে! কালে কালে হলো কি!

কলকাতার সম্বন্ধে ক্রমশঃই তাঁর আশঙ্কা হতে থাকে। তাঁর ভাবনা হয়, এখানকার ভয়াবহ বৈজ্ঞানিকেরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে, কোন দিন হয়তো বাগে পেয়ে গোবরার থেকেই না স্তো বার করে বসে বানাতে পারলে, তখন তাকে ফেলে মাকু ঠেলে গোবরাকে কাপড় বানিয়ে ফেলতে কতোক্ষণ? সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সাড়ে তিন হাতের এক ভাইকে, একমাত্র ভাইকে: আর বাড়ি ফিরে গেলেন এক জোড়া দশ-হাতি কাপড় নিয়ে। না হয় সাড়ে তিন জোড়া কাপড়ই হলো, তাতেও এমন বিশেষ কিছু সান্ত্বনা তিনি পান না, তেমন কিছু লাভও চোখে পড়ে না তাঁর।

'বলছে ভালো ভালো শাল-দোশালা আছে। ওপরে ডেকে আনবো?' গোবরা তাঁর দুশ্চিন্তায় বাধা দিয়েছে।

'আনবি, আনা উচিত হবে?' ভাইয়ের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে, কৌতূহল তিনি দমন করতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু গোবর্ধনের উৎসাহ দেখে তিনি অনুমতি দিয়ে ফেলেন।

'কিন্তু এই সব লোকের সঙ্গে বেশি মিশিস নে যেন। এরা বৈজ্ঞানিকেরা বড়ো সুবিধের লোক নয়! ভাব করিস নে এদের সঙ্গে কদাপি না।'

প্রকাণ্ড একটা বস্তাবাহীকে আনুষঙ্গিক করে যে ব্যক্তিটি উপরে এসে উপনীত হয়, বৈজ্ঞানিক কিনা বলা যায় না, তবে ফেরিওয়ালা বলেই তাকে বেশি সন্দেহ হতে থাকে।

তবে সন্দেহ তাঁর বহুক্ষণ হয় না, ছায়াপাতের সঙ্গে সঙ্গেই, শাল-দোশালার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হবা-মাত্রই, নিঃশেষে তা মিলিয়ে যায়। শাল কাঠের কাপড় দেখে তিনি তো আত্মহারা হয়ে পড়েন, যাদের তাঁরা এতোদিন

চেলিয়ে চিণে হদ্দমুদ্দই তক্তাই কেবল বানাতে পেরেছেন, তথাপি তারা প্রায় শক্তই থেকে গেছে, বলতে গেলে ; সেই নিতান্ত অপদার্থদেরই, কী অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক-কৌশলে যে এমন চমৎকার, এমন চোস্ত আর এমন মোলায়েম জিনিসে পরিণত করা হয়েছে, তা তাঁর ধারণারও অতীত। আবার রঙের বাহারই বা কতো। হর্ষবর্ধন একেবারে মশগুল হয়ে গেছেন, দু'চোখ ছানাবড়া করে ফেলেছেন। বহুক্ষণ পরে 'বাঃ' ছাড়া আর কোনো বাক্যই বেরোয়নি তাঁর মুখ থেকে।

গোবর্ধনের উৎসুক জিজ্ঞাসার জবাবে শালওয়ালা তার দামের আন্দাজ জানিয়েছে।

'বটে ? পাঁচ টাকা থেকে পাঁচশো টাকা ? তা হবে বই কি, দামী একটু হবেই। শাল গাছ তো আর সস্তা নয়, আর ক'টা গাছে একটা কাপড় হয় কে জানে! পাঁচশো টাকা আর বেশি কি এমন ?'

'পাঁচ টাকারগুলো বোধহয় শালপাতার তৈরী, কি বলো দাদা ?

'তা নইলে কি অতো সুবিধের দিতে পারে ? আমরা কিন্তু দামীটাই কিনবো। বের করো তো বাপু—দুখানা পাঁচশো টাকারই দাও, কি করবে ওর চেয়ে বেশি দামের নেই তোমার কাছে ?'

'হাজার টাকা দামের শাল নেই ?' গোবরা জিগ্যেস করেছে। শালওয়ালা তৎক্ষণাৎ দুটো দুহাজারী শাল সৃষ্টি করে ফেলেছে অবলীলা-ক্রমেই। অবশ্য শ্রীমতী ভানুমতীর অনুমতি নিয়ে।

'হাজার কেন বাবু, দু'হাজার টাকা দামেরও মাল আছে আমার কাছে।' সুবর্ণসুযোগকে সাগ্রহে সে গ্রহণ করেছে : 'উম্‌দা সব চীজ আমীর লোকের জন্যেই তো বাবু!'

'আছে ? বটে ? তবে দু'হাজার টাকারই দু'খানা দাও।' মহাসমারোহেই হর্ষবর্ধন শালদের অভ্যর্থনা করেছেন : 'এ তো আমাদেরই জিনিস! আমাদের বুনো আত্মীয়! জংলী বন্ধু আমাদের। কেবল কলকাতায় এসে বৈজ্ঞানিকের ফেরে পড়েই এই দুর্দশা না!'

'দুর্দশা কেন?' শালের জবানীতে গোবরা আপত্তি জানায়: 'কেন, ভালোই তো করেছে বৈজ্ঞানিকে। চেহারাই ফিরিয়ে দিয়েছে সব এদের।'

'কিন্তু পরমায়ু কমিয়ে দিয়েছে কতো!. সেটা তো দেখছিস নে! একটা শাল কাঠের আসবাব পুরুষানুক্রমে টিকে থাকে, জন্মজন্মান্তর ভোগ—দখল করা যায়, কিন্তু কাপড় হয়ে এ বাঁচবে ক'দিন? একবার ছিঁড়লেই হলো? শাল গাছের ন্যাকড়া তখন। হায় হায়!

আত্মীয়ের বিয়োগব্যথায় হর্ষবর্ধন বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। কাতর হবার কথা সত্যই।

'তা হোগ গে!' গোবর্ধন দাদার শোকে সান্ত্বনা দিয়েছে: 'জংলী জিনিসকে একেবারে সভা বানিয়ে দিয়েছে, আবার কি করবে?

দু'হাজার টাকা দক্ষিণা নিয়ে, দু'খানা আলোয়ান গছিয়ে, শালওয়ালা যতো শীঘ্র পেরেছে পিটটান দিয়েছে, ফিরেও তাকাতে ভরসা পায়নি আর। যদি আবার 'পুনর্গছিত' হয়ে যায়। প্রায় দেড় মাইল পেরিয়ে তবে সে ফের শাল-দোশালার হাঁক ছেড়েই ভেবেছে, আর কেন? অন্ততঃ আজ আর কেন? বাণিজ্যের পরিস্থিতি বিবেচনা করে হাঁক ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছে, আজকের মতো।

দু'হাজার টাকায় হালকা হয়ে হর্ষবর্ধনরা কিন্তু দুঃখিত নন। না, একেবারেই বিমর্ষ নন তাঁরা। বরং অপরিচিত বৈজ্ঞানিক অনাহূত বাড়ি বয়ে এসে অযাচিত শাল দান করে গেছে হোক না কেন কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে, তাতেই কি? তাই ভেবেই তাঁদের অন্তর সকৃতজ্ঞ হয়ে আছে তখন থেকে। তাঁদের অমূল্য কাঠ যে কোনোদিন নিজেদের গায়ে উঠবে (অন্তিমে দেহ-রক্ষার পূর্বে) এবং গায়ে উঠবে এতো হাল্‌কা হয়ে, মোলায়েম হয়ে, আর এ হেন বেমালুম হয়ে, এ কথা কোনোদিন তাঁরা কল্পনা করতে পারেননি। শাল গাছ ভেঙে গায়ে পড়তে পারে ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়েছে আগে, ঘুমের ঘোরেও তার মড়মড়ানি শুনে শিউরে উঠেছেন, বুকে ধড়ফড়ানি থামতে চায় নি সেই শাল যে একদা এতোখানি গায়ে-পড়া হবে, কেবল গায়ে-পড়া নয়, হামেসা গলাগলি হয়ে মেলামেশা করবে, ভাবতেই পারেননি কখনও। সেই

বস্তু, সম্বন্ধীয় চেয়েও মধুরতর সম্বন্ধে, নিকটতর সম্পর্কে, অনিষ্টহীন ঘনিষ্টতায়, সম্প্রতি তাঁদের সর্বাঙ্গে বিজড়িত। ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়! অপরূপ রূপকথাই যেন! শালের গর্বে তাঁদের ক্রমশঃই বিশালতর হয়েছে!

আনন্দের অতিশয্যে গোবরা তখনই প্রস্তাব করে বসেছে: চলো দাদা, গায়ে জড়িয়ে একটু বেড়িয়ে আসা যাক।'

পরমুহুর্তেই তাঁরা আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন রাস্তায়, শাল গায়ে চাপিয়ে বেড়াতে!

কিন্তু অঙ্গে শালের ঠাঁই দিয়েও, যদি উঁচু নজর নাই থাকে, দুঃখের কারণ প্রায়ই ঘটে। যেতে যেতে অকস্মাৎ হর্ষবর্ধনের মনে হয়েছে কী যেন পড়লো অন্তরীক্ষ থেকে—নিতান্ত ঘাড়ের কাছটাতেই তিনি ঘাড় কাৎ করে দেখেছেন, তার পরে আকাশ দৃকপাত করে দেখেছেন—না, সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়।

বিরক্তিব্যঞ্জক একমাত্র ধ্বনি বেরিয়েছে তাঁর মুখ দিয়ে: 'ছ্যা!' গোবর্ধনও দাদার দৃষ্টির অনুসরণ করছে, তারপরে, প্রতিধ্বনি না করেই, শালকে গা থেকে খুলে পুঁটুলি-প্রমাণ বানিয়ে নিজের বগলের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে বিনা বাক্যব্যয়ে।

কাকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ছিলো কিনা বলা যায় না একটু যেতেই কাছাকাছি একটা শাল-কাচানোর দোকান সামনে পড়েছে। গোবরা দাদার শালটা কাচতে দেবার ইঙ্গিত করেছে, হর্ষবর্ধন কিন্তু তাতে আপত্তি জানিয়েছেন: 'কী হবে আর কাচতে দিয়ে? বাড়ি গিয়ে খুলে ফেলতেই হয়; রাস্তায় ফেলে দেওয়া চলে, কাউকে বিলিয়ে দেয়াই বা মন্দ কি? তারপর একটা ভালো দেখে, নতুন দেখে কিনে নিলেই হলো। কালকেই আবার এসে পড়তে পারে সেই বৈজ্ঞানিকটা। আরো বেশি দামী দামী শাল নিয়ে কাল সকালেই হয়তো এসে পড়বে।'

গোবরা দাদার চেয়ে বিবেচক। সে বলছে: বাঃ, গায়ে না দাও, চৌকিতে পাতা চলবে তো? বিছানার চাদর করতে দোষ কি? ক্ষতিই বা কী?'

শালের-চাদর প্রস্তাবটা নেহাৎ অমনঃপূত হয়নি হর্ষবর্ধনের তক্ষুনি কাচানো-ওলাকে শালটা সম্প্রদান করে ফেলেছেন ; 'কতো লাগবে বাপু আর কবে ফেরৎ পাওয়া যাবে, বলো তো ঠিক করে ?'

'কালই সকালে দিয়ে আসবো, আপনার বাড়িতে। ভালো আলোয়ান কিনা, কাচতে যত্ন লাগবে, কতো আর দেবেন ? টাকা দুই দিলেই চলবে।'

'মোটে দু'টাকা ? এতো দামি জিনিস কাচতে দু'টাকা মাত্র ? বলো কি হে ?' মণিব্যাগ থেকে একখানা দীর্ঘকার নোট বার করেছেন হর্ষবর্ধন : 'বেশ, তাই। আটানব্বইটা টাকা আছে তো ?

'অতো টাকা, গরীব মানুষ আমরা, কোথায় পাবো—বাবু ?'

'বাঃ, একশো টাকার নোট যে !' গোবরা প্রাঞ্জল করছে : 'তা ছাড়া খুচরো নোট তো নেই আমাদের সঙ্গে।'

'তবে তোরটাও ওকে ধোলাই করতে দিয়ে দে না, গোবরা ?

'কিন্তু তাতেই আর কতো বাড়বে, বলো ? চার টাকাই তো ? শালটাকে বগলচুত করতে করতে গোবরা বলেছে।

'এই নাও' এই শাল দুটো, আর, এই নাও নোটখানা। হর্ষবর্ধন উপদেশ দিয়েছেন : পঁচিশবার করে কাচবে প্রত্যেকখানা, তা হলেই একশো টাকা ফুরিয়ে যাবে। এক পয়সাও ফেরৎ দিতে হবে না তোমাকে। চুকে যাবে হাঙ্গামা ! না—কি বলিস গোবরা ? পঞ্চাশবার করেই কাচবে নাকি ? আর একখানা নোট তা হলে দিয়ে দেবো ওকে ? পঁচিশবারে কি যথেষ্ট পরিস্কার হবে না বলে তোর মনে হয় ? না পাঁচশোবারই কাচিয়ে ফেলবো একেবারে ? কী বলিস তুই, য়্যাঁ ?

এক সঙ্গে এক গাদা নোট তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন।

প্রতিবাদ এসেছে শাল—কাচিয়ের দিক থেকেই। নিজেই, সে আপত্তি করেছে, পঁচিশবারের কাচাকাচিই সারাদিনে কুলিয়ে ওঠানো অসম্ভব, তার ওপরে আরো পঁচিশ কিংবা পাঁচশো ধাক্কা বাড়লে নেহাৎ অক্কার দিকেই পা বাড়তে, বেমক্কাই মারা পড়তে হবে ওকে। অবশ্যি তাতে করে আরো বেশি পরিস্কার হবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু এতো বেশি নির্ঘাৎ যে যাকে বলা যেতে পারে,

একদম পরিষ্কার! ঢাকাই মসলিনের চেয়েও আরও সূক্ষ্মতর হয়তো, চর্মচক্ষে দেখতে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে! শালও জখম, সে নিজেও খতম। আরো একশো টাকা, কি এক হাজার, এমন কি দশ হাজার টাকার নগদ মজুরিতেও সে কর্ণপাত করেনি, কানে আঙুল দিয়ে পিছিয়ে গেছে সভয়ে, হর্ষবর্ধনের পরামর্শকে অবহেলা করেছে অকাতরেই; পীড়াপীড়িতেও কিছুতেই, অর্থগ্রহণে মুক্তহস্ত হতে রাজি করানো যায়নি তাকে। অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে অবশেষে পঁচিশবারের কড়ায়েই রক্ষা করেছেন দু'ভাই। কী আর করবেন? ওঁদের অবশ্য কারো বেশি এবং আরো পরিষ্কার দেখার কৌতূহল ছিলো, কিন্তু মজুরিতে না পোষালে কারুকে বেশি কড়াকড়ি করা চলে কি? তোমরাই বলো?

পরদিন প্রাতঃকালে ওঁদের ঘুম ভালো করে ভাঙতে-না-ভাঙতেই আবার তেমনি কড়া নাড়ার বিকট আওয়াজ শোনা গেছে সদরে। হর্ষবর্ধন পাশ ফেরার প্রলোভন সম্বরণ করেছেন: সেই বৈজ্ঞানিক এসেছে বোধ হয়। সমাদর করে নিয়ে আয় গে?'

'কিন্তু যাই বলো দাদা, কড়া-ধ্বনি কখনও চাটু হয় না।' যেতে যেতে অসন্তোষ-জ্ঞাপন করেছে গোবরা। 'কড়াতে আর চাটুতে অনেক তফাৎ।'

'কিন্তু না, সে বৈজ্ঞানিক না ভুলবশতঃ, বা দৈবক্রমে, নিতান্তই এসে হাজির।

'এই নিন বাবু, আপনাদের শাল? এই বলে ছোটো-খাটো, কিন্তু বেশ হৃষ্টপুষ্ট দুখানি রুমাল সে বার করে দেয়। 'আর এই নিন ষোল টাকা ফেরত।

'এই সেই শাল নাকি? দু'ভাই পরস্পরের দিকে তাকান, বিমূঢ় হয়ে। 'এ্যাতো খাটো হয়ে গেল কি করে?' ভারী হকচকিয়ে যান হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন।

'আর টাকাই বা কিসের?' বিস্ময়ের উপর আরো বিস্ময়! কিসের ফেরত টাকা?

'একুশবারের বেশি কিছুতেই ধোলাই করা গেল না, তাই বাকী মজুরী ফেরত দিলাম, মশাই! শাল-কাচিয়ে বলে, দারুণ বিরক্তির সঙ্গেই বলে, কি শাল বাবু আপনাদের যতোই কাচি ততোই গুটিয়ে আসে, ক্রমেই কেমন জমে গিয়ে জড়ো হয়ে ছোটো হয়ে যায়!'

'বটে ভারী তাজ্জব! শালের বেয়াড়া হাব-ভাবে তাক লাগে দুই ভায়েরই।

'একুশবার কাচতেই তো এই দশা, তাতেই এই রুমালে দাঁড়িয়েছে। আর বেশি কাচতে সাহস হলো না মশাই, কি জানি, যদি ক্ষইতে ক্ষইতে খোয়া যায়, ছোট হতে হতে হারিয়ে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায় সব শেষে! তখন আপনারা তো আমাকেই দুষবেন, আলোয়ানের দোষ তো আর দেখবেন না, বাড়ির ছেলেরা দোষ করে আর কে দেখে, বলুন?'

'শালের এমন বদ অভ্যাস আর কখনও দেখেছো কি?' বেশ কৌতূহল হয় গোবরার।

'কখনো না। অবশ্যি কখনো-কখনো ধোয়ালে এক-আধটু খাটো হয় বটে, হয়েই যায় এমনিতেই, কিন্তু এতোদূর—উঁহু, এজন্মে দেখিনি বাবু! আর কি করেই বা দেখবো বলুন? কখনও তো একেবারে একুশবার কাচবার সুযোগ পাইনি, (যদিও ওর মতে সেটা দুর্যোগ) একুশবারেই একুশবার কেচেছি, হয়তো একুশ বছর ধরে—নজরে পড়েনি তাই আর!

শাল কাচিয়ে চলে যায়, সেলাম না করেই! একদিনেই বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারাঃ কাচানো শালের মতোই, কে যেন ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে ওকে।

হর্ষবর্ধনের ভাবনা শুরু হয়েছে। খবরের কাগজে যে সব নামজাদা প্রায় দেখা যায়—পামোলিভ্ ভিনোলিয়া মহীশূর চন্দন কিংবা কিউটিকিউরা, এমন কি একটু দামী কার্বলিক সোপেও, নিশ্চয় কাচানো হয়নি এদের; খেলো জিনিসে সস্তায় সারতে গিয়ে শালটাকে সেরে ফেলেছে একেবারে। বনেদী সাল এ সব। আসামের শালবনের! যে-সে জঙ্গলের না তো! কতোকালের অরণ্যানী এরা। মানী জিনিসের মর্যাদা রাখা হয়নি, ভাটা

সাবান মাখানো হয়েছে, চার ধার থেকেই মাথা কাটা গেছে বেচারার, তাতেই লজ্জায় একদম সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে—আর কিছু না!

নিজের ধারণা হর্ষবর্ধন বেশিক্ষণ ধারণ করেননি, ধড়েতে! তাই চাপা গলায় গোবরার কাছে বেফাঁস করেছেন : 'তাই আমার মনে হয়! তাতেই এ হাল হয়েছে শালের।'

'এ তো ধোলাই করা নয়, এ যে একেবারে আস্ত ধোলাই করা।' গোবরা খাপ্পা হয়ে গেছে; 'মার-পিটই বলা যেতে পারে বরং। আগে বললে না কেন দাদা? আমিও দিতাম ঐ ব্যাটাকে ধোলাই করে এক্ষুনি।'

'শাল-দোশালার কাণ্ড? কে জানবে বল্।' গদ্‌গদ্ কণ্ঠে হর্ষবর্ধন বলেন।

'শালের কথাই বলো! দোশালা তুমি পাচ্ছো কোথায় আবার? অন্য বস্তুর বিজ্ঞাপন শুনতে রাজি নয় গোবরা।

'কেন, পাচ্ছি না কেন? সামনেই পাচ্ছি। একজন হচ্ছে সেই বৈজ্ঞানিক, যে শাল জিম্মা দিয়ে গেছে, আর একজন ইনি, যিনি তার 'কিম্মা বানালে! এই দু'জনেই—তো।' হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা 'যাক গে, ভালোই হয়েছে। দু'হাজার টাকার দুখানা রুমাল—মন্দ কি আর এমন?'

হর্ষবর্ধন ভেবে চিন্তে খুশিই হন, লাটদেরও এতো দামী রুমাল নেই, সম্রাটদেরও না। সস্তা সাবানে কেচে শালটাকে একেবারে লাট করে ফেলেছে লোকটা। যাক, ভালোই করেছে। মন্দ কি—বাঃ বেড়ে হয়েছে —তোফা। বাঃ বাঃ!'

লাট-দু'জনকে, যতোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখেন, তাঁর হর্ষধ্বনি ততোই উথলে উঠতে থাকে। থামে না আর!

———

নরখাদকের কবলে

শিরোনাম দেখেই বুঝতে পারছ, এটা এক ভীষণ য়্যাডভেঞ্চারের গল্প। যথার্থই তাই, যদিও এটা পড়ে শেষাশেষি হয়ত তোমাদের হাসিই পাবে। সত্যিই ভারি রোমাঞ্চকর ঘটনা—নিতান্তই একবার আমি এক ভয়ঙ্কর নরখাদকের পাল্লায় পড়েছিলাম।

আফ্রিকার জঙ্গলে কি কোন অজ্ঞাত উপদ্বীপের উপকূলে নয়—এই বাংলাদেশের বুকেই একদিন ট্রেনে যেতে যেতে। সেই অভাবনীয় সাক্ষাতের কথা স্মরণ করলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয়।

বছর-আস্টেক আগের কথা, সবে ম্যাট্রিক পাশ করেছি—মামার বাড়ি যাচ্ছি বেড়াতে। রাণাঘাট পর্যন্ত যাব, তাই ফুর্তি করে যাবার মতলবে বাবার কাছে যা টাকা পেলাম তাই দিয়ে একখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে ফেললাম। বহুকাল থেকেই লোভ ছিল ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে চাপবার, এতদিনে তার সুযোগ পাওয়া গেল। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—কথাটা প্রায় ভুলে গেছলাম। ভুলে ভালোই করেছিলাম বোধ করি, নইলে এই অদ্ভুত কাহিনী শোনার সুযোগ পেতে না তোমরা!

সমস্ত কামরাটায় একা আমি, ভাবলাম কেউ আর আসবে না। তাহলে বেশ আরামে যাওয়া যাবে একলা একলা এইটুকু। কিন্তু গাড়ি ছাড়বার পূর্ব-মূহূর্তেই একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে উঠলেন। এক মাথা পাকা চুলই তাঁর বার্ধক্যের একমাত্র প্রমাণ, তা না হলে শরীরের বাঁধুনি, চলাফেরার উদ্যম, বেশ-বাসের ফিটফাট থেকে সঠিক তাঁর বয়স কত অনুমান করা শক্তই!

গাড়িতে আমরা দুজন, বয়সের পার্থক্য সত্বেও অল্পক্ষণেই আমাদের আলাপ জমে উঠলো। ভদ্রলোক বেশ মিশুক, প্রথম কথা পাড়লেন

তিনিই। এ-কথায় সে-কথায় আমরা দমদম এসে পৌঁছলাম। হঠাৎ একটা তারস্বর কানে এল আমাদের—"অজিত, এই অজিত, উঠে পড় চট্ করে। গাড়ি ছেড়ে দিল যেরে!"

সহসা ভদ্রলোকের সারা মুখ চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ত্বরিত দৃষ্টিতে সারা প্লাটফর্মটা একবার তিনি দেখে নিলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—'নাঃ, সে-অজিতের ধার কাছ দিয়েও যায় না!"

কিছু বুঝতে না পেরে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলাম। ভদ্রলোক বললেন—"অজিত নামটা শুনে একটা পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল আমার। কিন্তু নাঃ, এ-অজিত সে-অজিতের কড়ে-আঙুলের যোগ্যও নয়—এমনি খাসা ছিল সে অজিত! অমন মিষ্টি মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। চোখে দেখতে যেমন চেখে দেখতেও তেমনি। শুনবে তুমি তার কথা?"

আমি ঘাড় নাড়তে তিনি বললেন—"গল্পের মাঝ-পথে বাধা দিয়ো না কিন্তু। গল্প বলছি বটে, কিন্তু এর প্রত্যেকটা বর্ণ সত্য। শোনো তাহলে।—

জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে তিনি শুরু করলেন; বছর পঞ্চাশ কি তার বেশিই হবে, তখন উত্তর-বর্মায় যাওয়া খুব গুরুতর ছিল। চারিধারে জঙ্গল আর পাহাড়। পদে পদে বিপদ। জঙ্গল কেটে সবে নতুন রেল লাইন বসছে সেই অঞ্চলে—অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাঝে মাঝে এমন ধ্বসে যেত যে গাড়ি-চলাচল বন্ধ হয়ে যেত। তার ওপরে পাহাড়ে-ঝড়, আরণ্য-দাবানল হলে তো কথাই ছিল না। রেঙ্গুন থেকে সাহায্য এসে পৌঁছতে লাগত বহুত দিন—এর মধ্যে যাত্রীদের যে কী দুরবস্থা হোতো তা কেবল কল্পনাই করা যেতে পারে।

তখনকার উত্তর-বর্মা ছিল এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ঠাণ্ডা, রীতিমতন বরফ পড়ত তখন···সময়ে সময়ে চারিধারে সাদা বরফে জমে যেত। এখন তো মগের মুল্লুকের প্রকৃতি অনেক নম্র হয়ে

এসেছে, তার ব্যবহারও এখন ঢের ভদ্র। সেই সময়কার ব্রহ্মদেশের মেজাজ ভাবলে শিউরে উঠতে হয়!

সেই সময় একবার এক ভয়ানক বিপাকে আমি পড়েছিলাম—আমি এবং আরো আঠারো জন। আমরা উত্তর-বর্মায় যাচ্ছিলাম—আমরা উনিশজনই ছিলাম সেই গাড়িটার যাত্রী। উনিশজনাই বাঙালী। প্রথম রেল লাইন খুলেছিল, কিন্তু দুর্ঘটনার ভয়ে সেখানকার অধিবাসীরা কেউ রেল গাড়ি চাপত না। ভয় ভাঙাবার জন্যে রেল কোম্পানি প্রথম প্রথম বিনা-টিকিটে গাড়ি চাপবার লোভ দেখাতেন। বিনা-পয়সার লোভে নয়, য়্যাডভেঞ্চারের লোভে রেঙ্গুণের উনিশজন বাঙালী আমরা তো বেরিয়ে পড়লাম।

সহযাত্রী মোটে এই কজন—কাজেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হতে দেরি হোলো না। কোনখানে যে সেই ভয়াবহ পাহাড়ের ধ্বস নামল, আমার ঠিক মনে পড়ে না এখন, তবে রেলপথের প্রায় প্রান্ত সীমায় এসে পড়েছি। ওঃ সেই সঙ্গে সে কী ঝড়—সেই দুর্দান্ত ঝড় ঠেলে একটু একটু করে এগুচ্ছিল গাড়িটা,—অবশেষে একেবারেই থেমে গেল। সামনের রেল লাইন ছোট বড় পাথরের টুকরোয় ছেয়ে গেছে—সেইসব চাঙড় না সরিয়ে গাড়ি চালানোই অসম্ভব। অতএব পিছোনো ছাড়া উপায় ছিল না।

অনেকক্ষণ ধরে একমাইল আমরা পিছোলাম। এত আস্তে গাড়ি চলছিল, আর থামছিল, যে মানুষ হেঁটে গেলে তার চেয়ে বেশি যায়। কিন্তু পিছিয়েই কি রেহাই আছে? একটু পরেই জানা গেল যে পেছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আরো ধ্বস নেমেছে। ঘণ্টাখানেক আগে যে রেলপথ কাঁপিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটেছে, সেই পথের এখন আর কোথাও চিহ্নই নেই।

অতএব আবার এগুতে হলো। যেখানে যেখানে পাথরের টুকরো জমেছে, আমরা সব নেমে লাইন পরিষ্কার করব ঠিক হলো। তা ছাড়া আর কী উপায় বলো? কিন্তু সেদিকেও ছিল অদৃষ্টের পরিহাস। কিছুদূর এগিয়েই ঝড়ের প্রবল ঝাপটায় ট্রেন ডিরেলড্ হয়ে গেল।

লাইন থেকে পাথর তোলা এক কথা এবং গাড়িকে লাইনে তোলা আরেক কথা। পাঁচ দশজনে মিলে অনেক ধরাধরি করলে এক-আধটা পাথরের চাঙর যে না সরানো যায় তা নয়, কিন্তু সবাই মিলে বহুৎ ধ্বস্তাধ্বস্তি করলেও গাড়িকে লাইনে তোলা দূরে থাক এক ইঞ্চিও নড়ানো যায় না। এমন কি আমরা উনিশজন মিলেও যদি কোমর বেঁধে লাগি, তাহলেও তার একটা কামরাও লাইনে তুলতে পারব কি না সন্দেহ! তারপরে ঐ লম্বা চৌড়া পেল্লায় ইঞ্জিন—ওকে তুলতে হলেই তো চক্ষুস্থির! ওটা কত মণ কে জানে! আমরা ইঞ্জিনের দিকে একবার দৃক্‌পাত করে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম।

পেছনের অবস্থা তো দেখেই আসা গেছে, সামনেও যদি তাই ঘটে থাকে, তাহলেই তো চক্ষুস্থির। কেননা যেদিক থেকেই হোক, রেলপথ তৈরি করে সাহায্য এসে পৌছতে ক'দিন লাগবে কে জানে! চারিধারে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল, একশো মাইলের ভেতরে জনমনিষ্যির বাস আছে কি না সন্দেহ! ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গের যা খাবার-দাবার তা তো এক নিঃশ্বাসেই নিঃশেষ হবে—তারপর? যদি আরো দু'দিন এইভাবে থাকতে হয়? আরো দু'সপ্তাহ? কিম্বা আরো দু'মাস? ভাবতেও বুকের রক্ত হিম হয়।

পরের কথা তো পরে—এখন কী করে রক্ষা পাই? যে প্রলয় ঝড়, গাড়ি সমেত উড়িয়ে না নিয়ে যায় তো বাঁচি। মাঝে মাঝে যা এক-একটা ঝাপটা দিচ্ছিল, উড়িয়ে না নিক, গাড়িকে কাৎ কিম্বা চিৎপাৎ করার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। নিজের নিজের রুচিমত রামনাম দুর্গানাম, কিম্বা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নাম জপতে শুরু করলাম আমরা।

সে-রাত তো কাটল কোনোরকমে, ঝড়ও থেমে গেল ভোরের দিকটায়। কিন্তু ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে খিদেও জোর হয়ে উঠলো। বর্মার হাওয়ায় খুব খিদে হয় শুনেছিলাম, প্রথম দিনেই সেটা টের পাওয়া গেল। খিদের বিশেষ অপরাধ ছিল না—যে হাওয়াটা কাল আমাদের ওপর দিয়ে গেছে!

কিন্তু নাঃ, কারও টিফিন ক্যারিয়ারে কিছু নেই, যার যা ছিল কাল

রাত্রেই চেটে-পুটে সব সাবাড়। কেবল এ্যালুমিনিয়াম বাটিগুলো পড়ে রয়েছে, আমাদের উদরের মত শোচনীয় অবস্থায়—বিলকুল ফাঁকা! সমস্ত দিন যে কি অস্বস্তিতে কাটল কী বলব! রাত্রে কষ্ট-কল্পিত নিদ্রার মধ্যে তবু কিছু শান্তির সন্ধান পাওয়া গেল—বড় বড় ভোজের স্বপ্ন দেখলাম।

দ্বিতীয় দিন যা অবস্থা দাঁড়ালো, তা আর কহতব্য নয়। সমস্ত ক্ষণ গল্পগুজব করে তর্কাতর্কি করে, বাজে বকে, উচ্চাঙ্গ গবেষণার ভাণ করে, খিদের তাড়নাটা ভুলে থাকবার চেষ্টা করলাম। গোঁফে চাড়া দিয়ে খাবার চাড়টা দমিয়ে দিতে চাইলাম,—তারপরে এল তৃতীয় দিন।

সেদিন আর কথা বলবারই উৎসাহ নেই কারো···রেলগাড়ির চারদিকে ঘুরে, আনাচ-কানাচ লক্ষ করে, অসম্ভব আহার্যের অস্তিত্ব পরিকল্পনায় সেদিনটা কাটল। চতুর্থ দিনে আমাদের নড়াচড়ার স্পৃহা পর্যন্ত লোপ পেল···সবাই এক-এক কোনে বসে দারুণভাবে মাথা ঘামাতে লাগলাম।

তারপর পঞ্চম দিন। নাঃ, এবার প্রকাশ করতেই হবে কথাটা··· আর চেপে রাখা যায় না। কাল সকাল থেকেই কথাটা আমাদের মনে উঁকি মারছিল, বিকেল নাগাদ কায়েম হয়ে বসেছিল··এখন প্রত্যেকের জীভের ডগায় এসে অপেক্ষা করছে সেই মারাত্মক কথাটা ···বোমার মত ফাটল বলে এই। বিবর্ণ, রোগা,···বিশ্রী বিশ্বেশ্বরবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বক্তৃতার কায়দায় শুরু করলেন···"সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ"···

কী কথাটা যে আসছে আমরা সকলেই তা অনুমান করতে পেরেছি। উনিশজোড়া চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি এক মূহূর্তে যেন বদলে গেল, অপূর্ব সম্ভাবনার আসন্ন প্রত্যাশায় সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে নড়েচড়ে বসলাম।

বিশ্বনাথ বাবু বলে চললেন··"ভদ্রমহোদয়গণ, আর বিলম্ব করা চলে না। অহেতুক লজ্জা, সঙ্কোচ বা সৌজন্যের অবকাশ নেই। সময় খুব সংক্ষিপ্ত—আমাদের মধ্যে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি আজ বাকি

সকলের খাদ্য যোগাবেন, এখনই আমাদের তা স্থির করতে হবে।”

শৈলেশবাবু উঠে বললেন, “আমি ভোলানাথবাবুকে মনোনীত করলাম।”

ভোলানাথবাবু বললেন, “কিন্তু আমার পছন্দ অমৃতবাবুকেই”।

অমৃতবাবু উঠলেন অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে তিনি লজ্জিত কি বিড়ম্বিত বোঝা গেল না ঠিক, নিজের সুপুষ্ট দেহকেই আজ সবচেয়ে বড় শত্রু বলে তাঁর বিবেচনা হলো। আমতা আমতা করে তিনি বললেন, “বিশ্বনাথবাবু আমাদের মধ্যে প্রবীণ এবং শ্রদ্ধেয়, তা ছাড়া তিনি একজন বড় বক্তাও বটেন। আমার মতে প্রাথমিক সম্মানটা তাঁকেই দেওয়া উচিত, অতএব তাঁর সপক্ষে আমি নিজের মনোনয়ন প্রত্যাহার করছি।”

অমৃত আস্বাদে তাঁর দারুণ আনীহা—বোঝা গেল বেশ।

কমল দত্ত বললেন, “যদি কারুর আপত্তি না থাকে তাহলে অমৃতবাবুর অভিলাষ গ্রাহ্য করা হবে।”

সুধাংশুবাবু আপত্তি করাতে অমৃতবাবুর পদত্যাগ অগ্রাহ্য হোলো; এই একই কারণে ভোলানাথবাবুর রেজিগনেশনও গৃহীত হোলো না।

শঙ্করবাবু বললেন, “ভোলানাথবাবু এবং অমৃতবাবু—এঁদের মধ্যে কার আবেদন গ্রাহ্য করা হবে, অতঃপর ভোটের দ্বারা তা স্থির করা যাক।’

আমি এই সুযোগটা গ্রহণ করলাম, “ভোটাভূটির ব্যাপারে একজন চেয়ারম্যান দরকার, নইলে ভোট গুনবে কে? অতএব আমি নিজেকে চেয়ারম্যান মনোনীত করলাম।”

ওদের মধ্যে আমিই ছিলাম দূরদর্শী, সাহায্য এসে না পৌঁছানো তক্ নিত্যকার ভোটায়নের জন্যে চেয়ারম্যানকেই কষ্ট করে টিকে থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত, এটা আমি সূত্রপাতেই বুঝতে পেরেছিলাম। অমৃতবাবুর দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকাতে, আমি সকলের বিনা অসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়ে গেলাম।

অতঃপর প্রভাসবাবু উঠে বললেন, “আজকের দুপুরবেলার জন্যে

ছুজনের কাকে বেছে নেওয়া হবে, সেটা এবার সভাপতি মশাই ব্যালটের দ্বারা স্থির করুন।"

নাহুবাবু বললেন, "আমার মতে ভোলানাথবাবু নির্বাচনের গৌরব লাভের অযোগ্য! যদিও তিনি কচি এবং কাঁচা, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি অত্যন্ত রোগা ও সিড়িঙ্গে! অমৃতবাবুর পরিধিকে, অন্তত এই দুঃসময়ে, আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না।"

শৈলেশবাবু বললেন, "অমৃতবাবুর মধ্যে কী আছে? কেবল মোটা মোটা হাড় আর ছিবড়ে। আর কোন গুণ নেই। তাছাড়া অতো পাকা মাংস আমার অপচ্ছন্দ, অত চর্বিও আমার ধাতে সয় না। সেই তুলনায় ভোলানাথবাবু হচ্ছেন ভালুকের কাছে পাঁঠা। ভালুকের ওজন বেশি হতে পারে—কিন্তু ভোজনের বেলায় পাঁঠাতেই আমাদের রুচি।"

নাহুবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "অমৃতবাবুর রীতিমত মানহানি হয়েছে, তাঁকে ভালুক বলা হয়েছে—অমৃতবাবুর ভয়ানক রেগে যাওয়া উচিত আর ঘোরতর প্রতিবাদ করা উচিত—"

অমৃতবাবু বললেন, "শৈলেশবাবু ঠিকই বলেছেন, এত বড় খাঁটি কথা কেউ বলেনি আমার সম্বন্ধে। আমি যথার্থই একটা ভালুক। ভালুক ছাড়া কিছু না।"

অমৃতবাবুর মত কুটতার্কিক যে এত সহজে পরের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন, আশা করতে পারিনি। বুঝতে পারলাম, তাঁর আত্মগ্লানির মূলে রয়েছে struggle for existence। যাক; ব্যালট নেওয়া হোলো। কেবল ভোলানাথবাবুর নিজের ছাড়া আর সকলের ভোট তার সপক্ষে গেল। অমৃতবাবুর বেলাও তাই, একমাত্র অমৃতবাবু স্বয়ং নিজের বিপক্ষে ভোট দিলেন।

অগত্যা দু'জনের নাম একসঙ্গে ব্যালটে দেওয়া হোলো—দু'জনেই সমান সমান ভোট পেলেন। অর্ধেক লোক পরিপুষ্টতার পক্ষপাতী, বাকি অর্ধেকের মত হচ্ছে, যৌবনে দাও রাজটীকা'।

এরূপ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান সভাপতির ওপর নির্ভর করে;

আমার ভোটটা অমৃতবাবুর তরফে দিয়ে অশোভন নির্বাচন প্রতি-যোগিতার অবসান করলাম। বলা বাহুল্য, এতদিনের একাদশীর পর অমৃতে আমার বিশেষ অরুচি ছিল না।

ভোলানাথবাবুর পরাজয়ে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ দেখা দিল, তাঁরা নতুন ব্যালট দাবি করে বসলেন। কিন্তু রান্নাবান্নার জোগাড়ের জন্যে মহা সমারোহে সভাভঙ্গ হয়ে যাওয়ায়, ভোলানাথ-বাবুকে বাধ্য হয়ে স্থগিত রাখতে হলো। তাঁর পৃষ্ঠপোষকরা নোটিশ দিয়ে রাখলেন, পরদিনের নির্বাচনে তাঁরা পুনরায় ভোলানাথবাবুর নাম তুলবেন। কালও যদি যোগ্যতম ব্যক্তির দাবি অগ্রাহ্য করা হয়, তাহলে তাঁরা সবাই একযোগে 'হাঙ্গার-স্ট্রাইক' করবেন বলে শাসালেন।

কয়েক মুহূর্তেই কী পরিবর্তন! পাঁচদিন নিরাহারের পর চমৎকার ভোজের প্রত্যাশায় প্রত্যেকের জিভই তখন লালায়িত হয়ে উঠেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা যেন আশ্চর্য রকম বদলে গেলাম—কিছুক্ষণ আগে আমরা ছিলাম আশাহীন, ভাষাহীন, খিদের তাড়নায় উন্মাদ—অর্ধমৃত; আর তখন আমাদের মনে আশা, চোখে দীপ্তি, অন্তরে উচ্ছল ভালোবাসা—এমন একটা প্রগাঢ় প্রেম, যা মানুষের প্রতি মানুষ কদাচই অনুভব করে। এমন একটা অপূর্ব পুলক, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! অর্ধ-মুমূর্ষুতা থেকে একেবারে নতুন জীবন! আমি শপথ করে বলতে পারি, তেমন অনির্বচনীয় লালায়িত এক অনুভূতির আস্বাদ জীবনে আমি কখনো পাইনি।

অমৃতকে আমি আন্তরিক পছন্দ করেছিলাম। সত্যিই ভালো লেগেছিল ওকে আমার। স্থূল মাংসল বপু, যদিও কিছু অতিরিক্ত রোমশ (শৈলেশবাবু ভালুক বলে বেশি ভুল করেননি), তবু ওঁকে দেখলেই চিত্ত আশ্বস্ত হয়, মন কেমন খুশি হয়ে ওঠে। ভোলানাথও মন্দ নন অবশ্য; যদিও একটু রোগা, তবু উঁচুদরের জিনিস তাতে সন্দেহ নেই। তবে পুষ্টিকারিতা এবং উপকারিতার দিক থেকে বিবেচনা করলে অমৃতর দাবি সর্বপ্রথম। অবশ্য ভোলানাথের

উৎকৃষ্টতার সপক্ষেও অনেক-কিছু বলবার আছে, তা আমি অস্বীকার করবার চেষ্টা করব না। তবু মধ্যাহ্ন ভোজনের পাতায় পড়বার যোগ্যতা ওঁর ছিল না, বড়-জোর বিকেলের জলখাবার হিসেবে ওঁকে ধরা যেতে পারে।

দীর্ঘ উপবাসের পর প্রথম দিনের আহারটা একটু গুরুতরই হয়ে গেল। অমৃত এতটা গুরুপাক হবে আমরা ভাবিনি—বাইরে থাকতে যিনি আমাদের হৃদয়ে এতটা আবেগ সঞ্চার করেছিলেন, ভিতরে গিয়ে তিনি যথেষ্টই বেগ দিলেন। সারা দিন আমরা অমৃতের চোঁয়া ঢেঁকুর তুললাম। সকলেরই পেট (এবং সঙ্গে সঙ্গে মন) খারাপ থাকায়, পরদিন লঘু পথ্যের ব্যবস্থাই সঙ্গত স্থির হলো—এতএব কচি ও কাঁচা ভোলানাথ বাবুকে জলযোগ করেই সেদিন আমরা ক্ষান্ত হলাম।

তার পরদিন আমরা অজিতকে নির্বাচিত করলাম। ওরকম সুস্বাদু কিছু কখনো আমরা খাইনি জীবনে। আর সত্যিই ছিল খুব উপাদেয়, তার বৌকে চিঠি লিখে পরে আমি সে-কথা জানিয়েছি। এক মুখে তার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না—চিরদিন ওকে আমার মনে থাকবে। দেখতেও যেমন সুশ্রী, তেমনি মার্জিতরুচি, তেমনি চারটে ভাষায় ওর দখল ছিল। বাংলা তো বলতে পারতই, তা ছাড়া ইংরিজি, হিন্দী এবং উড়েতেও অনর্গল তার খই ফুটত। হিন্দি একটু ভুলই বলত, তা বলুক গে, তেমনি এক-আধটু ফ্রেঞ্চ আর জার্মানও ওর জানা ছিল, তাতেই ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছল। ক্যারিকেচার করতেও জানত, সুর ভাঁজতেও পারত,—বেশ মজলিসী লোক যাকে বলে এক কথায়, অমন সরেশ জিনিস আর কখনো ভদ্রলোকের পাতে পড়েনি। খুব বেশি ছিবড়েও ছিল না, তেমন চর্বিও নয়, ওর ঝোলটাও ভারি খাসা হয়েছিল। সেই চর্বিত চর্বন এখনো যেন আমার জিভে লেগে আছে।

তার পরদিন বিশ্বনাথবাবুকে আমরা আত্মসাৎ করলাম—বুড়োটা যেমন ভূতের মত কালো তেমনি ফাঁকিবাজ, কিচ্ছু তার গায়ে রাখেনি, বলতে গেলে আমড়া—আঁটি আর চামড়া। এক গাল খেয়েই আমি

ঘোষণা করতে বাধ্য হলাম, 'বন্ধুগণ, আপনাদের যা খুশি করতে পারেন, আবার নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আমি হাত গুটোলাম।" শৈলেশবাবুও আমার পথে এলেন, বললেন—'আমারো ঐ মত। ততক্ষণ আমিও সবুর করব।'

অজিতকে সেবা করার পর থেকে আমাদের অন্তরে যে আত্ম-প্রসাদের ফল্গুধারা অগোচরে বইছিল, তাকে ক্ষুন্ন করতে কারোই ইচ্ছে ছিল না। কাজেই আবার ভোট নেওয়া শুরু হোলো—এবার সৌভাগ্যক্রমে শৈলেশবাবুই নির্বাচিত হলেন। তাঁর এবং আমাদের উভয়েরই সৌভাগ্য বলতে হবে; কেন না, কেবল রসিক লোক বলেই তাঁকে জানতাম, সরস লোক বলেও জানলাম আবার। তোমাদের বিশ্বকবির ভাষায় বলতে গেলে, তাঁর যে-পরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল, সেই নতুন পরিচয়ে তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ হলেন।

তারপর! তারপর—একে একে ব্যোমকেশ, নিরঞ্জন, কেদারনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ—গঙ্গাগোবিন্দর নির্বাচনে ভারী গোলমাল হয়েছিল, কেননা সে ছিল যেমন রোগা তেমনি বেঁটে—তারপরে নিতাই থোকদার—থোকদারের একটা পা ছিল কাঠের—সেটা এক থোক ক্ষতি, তবে সুস্বাদুতার দিক থেকে সে মন্দ ছিল না নেহাৎ—অবশেষে এক ব্যাটা ভ্যাগাবণ্ড, সঙ্গী হিসেবে সে মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না, খাদ্য হিসেবেও তাই। তবে রিলিফ এসে পৌঁছবার আগে যে তাকে খতম করতে পারা গেছল সেইটাই সুখের বিষয়। নিতান্তই একটা আপদ-চুকোনো দায় আর কি!

রুদ্ধ-নিশ্বাসে আমি ভদ্রলোকের কাহিনী শুনছিলাম, এতক্ষণে আমার বাক্যস্ফূর্তি হোলো—'তাহলে রিলিফ এসেছিল শেষটায়?'

'হ্যাঁ, কবির ভাষায়, একদা সুপ্রভাতে, সুন্দর সূর্যালোকে, নির্বাচনও সদ্য শেষ হয়েছে, আর রিলিফ ট্রেনও এসে পড়ল। ভগবানকে ধন্যবাদ যে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিল, তা নইলে আজ আমাকে দেখবার সৌভাগ্য হত না তোমার।—এই যে, বারাকপুর এসে পড়ল, এখানেই আমি নামব। বারাকপুরেই আমি থাকি গঙ্গার ধারে—

যদি কখনো সুবিধে হয়, দু'একদিনের জন্যে বেড়াতে এসো আমার ওখানে। ভারি খুশি হব তাহলে। তোমাকে দেখে আমার কেমন বাৎসল্য-ভাব জাগছে। বেশ ভালো লাগছে তোমাকে, এমন কি অজিতকে যতটা ভালো লেগেছিল, প্রায় ততখানিই, একথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। একটুও অত্যুক্তি নয়, তুমিও বেশ খাসা ছেলে,—আসি তাহলে।'

ভদ্রলোক বিদায় হলেন। এমন বিমূঢ়, বিভ্রান্ত আর বিপর্যস্ত আমি কখনো হয়নি। বৃদ্ধ চলে যাবার পর আমার আত্মাপুরুষ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু-মধুর, চালচলন অত্যন্ত ভদ্র—কিন্তু হলে কী হবে, যখনই তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আমার হাড়-পাঁজরা পর্যন্ত কেঁপে উঠছিল! কি রকম যেন ক্ষুধিত দৃষ্টি তাঁর চোখে—বাপস্! তারপর তাঁর বিদায়-বাণীতে যখন জানালেন যে তাঁর মারাত্মক স্নেহ-দৃষ্টি লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আমাকে দেখে স্বর্গত সেই স্নেহের অজিতের কথাই শুধু মনে হচ্ছে তাঁর, আর এমন কি তাঁর মতে অজিতের চেয়ে কোনো অংশেই আমি ন্যূন নই,—তেমনি খাসা এবং বোধকরি তেমনি উপাদেয়ই—তখন আমার বুকের কাঁপুনি পর্যন্ত বন্ধ হবার মত হয়েছিল!

তিনি যাবার আগে মাত্র একটি প্রশ্ন তাঁকে করতে পেরেছিলাম—'শেষ পর্যন্ত আপনাকেও কি ওরা নির্বাচন করেছিল? আপনি তো সভাপতি ছিলেন, তবে কী করে সেটা হোলো?'

'শেষ পর্যন্ত আমিই বাকি ছিলাম কিনা! আগের দিন ভ্যাগাবণ্ডটার পালা গেছল; আমি একাই সমস্তটা তাকে সাবাড় করেছিলাম। বলব কি, পাহাড়ের হাওয়ায় যেমন আমার খিদে হোতো, তেমনি হজম করবার ক্ষমতাও বেড়ে গেছল খুব। হতভাগা লোফারটা শেষ পর্যন্ত টিকেই ছিল, তার কারণ অখদ্যে লোক বলে তাকে খাদ্য করতে আর সবার আপত্তি ছিল! কিন্তু খাবার ব্যাপারে অত গোঁড়ামি নেই আমার—উদরের বিষয়ে আমি খুব উদার। তা ছাড়া এতদিনও নির্বাচিত হবার সুযোগ না পেয়ে নিশ্চয়ই অত্যন্ত মনক্ষোভ লেগেছিল

বেচারীর ; আমার কাছে আত্মমর্যাদা লাভ করে সে যে কৃতার্থ হয়েছে এতে আমার সন্দেহ নেই।

'হ্যাঁ, তুমি কী জানতে চাচ্ছিলে, আমি সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও, কী করে আমার পালা হোলো? পরদিন যথানিয়মে আবার নির্বাচনের সময় এল। কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায়, আমি যথারীতি নির্বাচিত হয়ে গেলাম—বিনা বাধায়। তারপর কারু আপত্তি না থাকায়, আমি তৎক্ষণাৎ সেই সম্মানার্হ পদত্যাগ করলাম। আপত্তি করবার কেউ ছিলও না তখন। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিল ট্রেনটা—দুরূহ কর্তব্যের দায় থেকে রেহাই পেলাম আমি—নিজেকে আর কষ্ট করে গলাধঃকরণ করতে হোলো না আমায়।'

গুরু চণ্ডালী

সীতানাথবাবু ছিলেন সেকেণ্ড পণ্ডিত, বাংলা পড়াতেন। ভাষার দিকে তাঁর দৃষ্টি একটুও ভাসা-ভাসা ছিল না—ছিল বেশ প্রখর। ছেলেদের লেখার মধ্যে গুরুচণ্ডালী তিনি মোটেই সইতে পারতেন না।

সপ্তাহের একটা ঘণ্টা ছিল ছেলেদের রচনার জন্যে বাঁধা। ছেলেরা বাড়ি থেকে রচনা লিখে আনতো—একেক সময়ে ক্লাসে বসেও লিখতো। সতীনাথ বাবু সেই সব রচনা পড়তেন, পড়ে পড়ে অগুন হতেন। ছাত্রদের সেই রচনা পরীক্ষা করা, সীতার অগ্নিপরীক্ষার মতই একটা উত্তপ্ত ব্যাপার ছিল সীতানাথবাবুর কাছে। যেমন তাঁর তেমনি আমাদেরও।

এত করে বকে ঝকেও, গুরুচণ্ডালী দোষ যে কাকে বলে ছাত্রদের তিনি তা বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি—উক্ত দোষমুক্ত করা তো দূরে থাক।

সেদিনও তিনি ক্লাসসুদ্ধ্ ছেলের রচনার খাতায় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন—

দেখতে দেখতে তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠলো, হাতের দু'রঙা পেন্সিলের লাল দিকটা ঘস ঘস করে চলতে লাগলো খাতার ওপর—রচনার লাইনগুলো ফসফস করে লাল দাগ কেটে কেটে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। এর চেয়ে ছেলেদের চাবুকে লাল করা যেন সোজা ছিলো অনেক—ছিল ঢের আরামের—আর তা করতে পারলে যেন গায়ের ঝাল মিটতো তাঁর।

খাতাগুলো পাশে সরিয়ে রেখে তিনি বললেন—'এ আর কী দেখবো! খালি গুরুচণ্ডালী। কতোবার করে বলেছি, হয় সাধু ভাষায় লেখো, নয় তো কথ্য ভাষায়। যেটাতেই লেখো তা ঠিক হবে। কিন্তু এক রকমের হওয়া চাই। সাধু ভাষায় আর কথ্য

ভাষায় মিশিয়ে খিচুড়ি পাকানো চলবে না। না, কিছুতেই না। কিন্তু এখনো দেখছি সেই খিচুরি—সেই জগাখিচুড়ি।'

গণেশ বললে—'আমি সাধুভাষায় লিখেছি স্যার।'

'সাধুভাষায় লিখেছো? এই তোমার সাধুভাষা?' সীতানাথবাবু গাদার ভেতর থেকে তার খাতাটিকে উৎখাত করেন—'কী হয়েছে এ?' 'দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল'? দুগ্ধফেননিভের সঙ্গে—

'কেন সার, 'করিয়া' তো দিয়েছি আমি? করিয়া কি সাধুভাষা হয়নি সার?'

'কিন্তু ধপাস? ধপাস কী ভাষা? দুগ্ধফেননিভের পরেই এই ধপাস?'

গণেশ এবার ফেননিভের মতই নিভে যায়, টুঁ শব্দটি করতে পারে না।

'কতোবার বলেছি তোমাদের যে ভাষার খিচুড়ি পাকিয়ো না। হয় সাধু ভাষায় নয় কথ্য ভাষায়—যেটায় হয় একটাতে লেখো। কিন্তু দেখো, আগাগোড়া যেন এক রকমের হয়। —গণেশের এই বাক্যটিকে তোমাদের মধ্যে নিখুঁত করে বলতে পারো কেউ?'

'পারি সার।' মানস উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু দাঁড়িয়েই মাথা চুলকোতে লাগলো সে। ধপাস-এর সাধুভাষা কী হবে তার জানা নেই। খানিক মাথা চুলকে খানিক আমতা আমতা করে সে নিজেও ধপাস করে বসে পড়লো। তার মানসে যে কী ছিলো তা জানা গেল না।

সরিৎ উঠে বললো, 'কিসে বলব সার? কথ্য ভাষায়, না অকথ্য ভাষায়?'

'যাতে তোমার প্রাণ চায়।'

'দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আয়েস করে বসলো।'

'দুগ্ধফেননিভের সঙ্গে আয়েস?' সীতানাথবাবু মুখখানা—উচ্ছের পায়েস খেলে যেমন হয় তেমনিধারা হয়ে ওঠেঃ 'ওহে বাপু!

গুরুচণ্ডালী কাকে বলে তা কি তোমাদের মগজে ঢুকেছে? মনে করো যে, যে চাঁড়ালটা আমাদের এই ইস্কুলে ঝাঁট দেয় সে যদি হেডমাষ্টার মশায়ের সঙ্গে একাসনে বসে তাহলে সেটা দেখতে কেমন লাগে তেমনি সেটা যেমন দৃষ্টিকটু দেখাবে, কতকগুলি সাধু শব্দের মধ্যে একটা অসাধু শব্দ ঢুকলে ঠিক সেইরকমই খারাপ দাঁড়ায়। কিন্তু দু'জন চাঁড়াল স্বচ্ছন্দে গলা ধরাধরি করে যেতে পারে—কারো চোখেই খারাপ দেখায় না। সাধু ভাষার যে শব্দ কথ্য ভাষার শব্দদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসতে পারে না, সেই কথাই আবার অন্যান্য সাধু শব্দের সঙ্গে মিশ খেয়ে বেশ মানিয়ে যেতে পারে—যেমন উদাহরণ-স্বরূপ—'

'বলবো সার? এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি।' বলে ওঠে গণেশ: দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আয়াস সহকারে বসিল। কিম্বা উপবেশন করিল।' হয়েছে সার এবার?'

'কিম্বা আরো বেশি সাধুতা করে আমরা বলতে পারি--' নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ায়: 'আসন গ্রহণ করিল। কিম্বা আসন পরিগ্রহ করিল।'

দীপক বলে, 'সমাসীন হইল'ও বলা যায়।'

'আবার তুই এর মধ্যে সমাস এনে ঢোকাচ্ছিস!' গণেশ তার কানের গোড়ায় ফিসফাস করে, 'এতেই কেঁদে কুল পাইনে, এর ওপর ফের সমাস?'

'যেমন উদাহরণস্বরূপ—'সীতানাথবাবু বলতে থাকেন, কিন্তু তাঁর বলার মাঝখানেই পিরিয়ডের ঘণ্টা বেজে যায়। উদাহরণের স্বরূপ প্রকাশের আগেই তাকে ক্লাস ছেড়ে যেতে হয়।

নিজের বক্তব্য আরেক দিনের জন্যে রেখে সমস্ত প্রশ্নটাই আমূল মুলতুবি করে যান।

দিন কয়েক পরে গণেশ রেশন আনতে গিয়ে দেখল যে সেকেণ্ড পণ্ডিত মশাই সেই সরকারী দোকানে এসেছেন। লম্বা লাইনের ফাঁকে সীতানাথবাবুও দাঁড়িয়ে। সেই কিউয়ের ভেতর মহল্লার ঝাড়ুদার—নিশ্চয়ই সে চণ্ডাল—যেমন রয়েছে, তেমনি আছে পাড়ার গুণ্ডারা। তারাও কিছু সাধু নয়। গুরুতর লোক। তাদের

প্রচণ্ডালই বলা যায় বরং। প্রচণ্ড তাদের দাপট।

পাড়ার সার এবং অসার—সবাই এক সারের মধ্যে খাড়া। একেবারে সমান। রীতিমতই **গুরুচণ্ডালী**।

সীতানাথবাবু ছিলেন সারির মাঝামাঝি। গণেশ অনেক পরে এসে শেষের দিকে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো সীতানাথবাবুকে। চণ্ডালদের মধ্যে গুরুদেব -ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ এই অভাবিত মিলন-দৃশ্য দেখে সে অবাক হল। সত্যি বলতে সে দৃশ্য অবাক হয়ে দেখবার মতই।

সীতানাথবাবুর **দৃষ্টি** কোনো দিকে ছিল না। অজগরের মত বিরাট লাইন যেন কচ্ছপের গতিতে এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছে।

কতক্ষণে রেশন নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরবেন, হাঁড়ি চড়িয়ে চান সেরে নাকে-মুখে দুটি গুঁজে পাড়ি দেবেন ইস্কুলে, সেই ভাবনাতেই সমস্ত মন পড়ে ছিল তার।

সহসা এক বালসুলভ তীক্ষ্ম কণ্ঠ তাঁর কানে এসে পিন ফোটালো। ফুটতেই তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন—

"সার, সার্! ব্যগ্র হোন কল্য! ব্যগ্র হোন কল্য!" শুনতে পেলেন তিনি।

শুনেই তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। দেখতে পেলেন গণেশকে। কিউয়ের শেষে দাঁড়িয়ে চিৎকার ছাড়ছে।

ব্যগ্র হোন কল্য? তার মানে? কেন তিনি ব্যগ্র হবেন? আর হন যদি বা তা কালকে কেন? ব্যগ্র যদি হতেই হয় তো আজকেই কেন নয়? এই মুহূর্তেই বা নয় কেন? আর, এই মুহূর্তে ব্যগ্র হয়েই বা কী হবে? কিউএর লাইন তো আর ছেলেদের খাতার লাইন নয় যে পেনসিলের এক খোঁচায় ফ্যাশ করে কেটে এগিয়ে যাবেন! যত তাড়াই থাক, যতই ব্যগ্র হন, আগের লোকদের কাটিয়ে এগুবার একটুও উপায় নেই এখানে। ফাঁড়ার মতোই অকাট্য এই লাইন। ফাঁড়ির মতই ভয়াবহ।

"সার সার—পুনরায়! পুনরায়! ব্যগ্র হন কল্য। ব্যগ্র হন

কল্য!" আবার সেই আর্তনাদ।

সীতানাথবাবুর ইচ্ছে করে এক্ষুনি গিয়ে—বেশ একটু ব্যগ্রভাবেই—গণেশের কান ছুটো ধরে মলে দেন আচ্ছা করে। বেশ করে মলে দিয়ে বলেন, এই মললাম অদ্য। ফের মলব কল্য। কিম্বা তুলে ধরে এক আছাড় মারেন ওকে। কিন্তু ওকে পাকড়াবার এই ব্যগ্রতা দেখাতে গিয়ে লাইনের জায়গা পা-ছাড়া করার কেনো মানে হয় না।

আস্তে আস্তে এগিয়ে দোকানের ভেতর পৌঁছে রেশনের দাম দিতে গিয়ে তাঁর চোখ কপালের কানায় ঠেকল—যেমন একটু আগে তাঁর কান চোখা হয়ে উঠেছিল। ছাখেন যে, তাঁর পকেট মারা গেছে। পকেটের যেখানে টাকার ব্যাগটা থাকে, থাকবার, সেখানটা ফাঁকা।

বৃথা হৈ-চৈ না করে বিরস মুখে তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে আসেন।

"সার, তখন আমি কী বলছিলাম? আমি অতো করে বললাম, তা আপনি কানই দিলেন না। আদৌ কর্ণপাতই করলেন না!" গণেশ অনেকটা এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। দোকানের মুখে পৌঁছে মাষ্টারের সম্মুখে পড়েছে।

"কী বলছিলে তুমি? তুমি তো আমায় কাল ব্যগ্র হতে বলছিলে? আর এদিকে আমার আজ সর্বনাশ হয়ে গেল!"

"কাল ব্যাগ্র হতে বলেছি? মোটেই না। আমি বলছিলাম আপনার 'ব্যাগ্র গ্রহণ করলো'। আপনার পরেই যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল না? সে হতভাগাই পেছন থেকে আপনার পকেটে হাত ঢুকিয়ে—"

"তা, 'পকেট মারলো' বলতে তোর কী হয়েছিলো রে হতমুখ্য?" সীতানাথবাবুর সমস্ত রাগ এখন গণেশের ওপর গিয়ে পড়ে—"সোজাসুজি তা বললে কী হোত? তাতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হোতো তোর? 'পকেট মারছে সার'—বলতে কী আটকাচ্ছিলো তোমার পাপ মুখে?"

"ছি ছি!" গণেশ নিজের জিভ কাটে—"অমন কথা বলবেন না

সার! 'পকেট মারছে'—সে-কথা কি আপনার সামনে আমি উচ্চারণ করতে পারি? পকেট প্রহার করছে বললেও তো শুদ্ধ হয় না। আর বলুন, গুরুমশায়ের সামনে অমন চণ্ডালের মতন ভাষা কি বলতে আছে—বলা যায় কি? ও কথা—অমন কথা বলবেন না সার। ব্যাগ গ্রহণ করল বলেছি—জানি যে, তাও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয় নি, গুরুচণ্ডালী একটুখানি যেন রয়ে গেছে; কিন্তু কি করবো, ব্যাগের সাধুভাষা যে কী তা তো আমার জানা নেই সার। কতো করে ভাবলাম, কিন্তু কিছুতেই ব্যাগের শুদ্ধটা আমার মগজে এলো না। এদিকে ভাবতে ভাবতে ব্যাগসুদ্ধ নিয়ে আপনার সট্‌কালো।"

ভূমিকা বনাম এজাহার

এটা বইয়ের ভূমিকা নয়, আমার এজাহার। বইটার সঙ্গে একটা হত্যাকাণ্ড জড়ানো। আর প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডেই, আসামীকে, এমনি, আসামী না হয়েও অনেককে এজাহার দিতে হয়। হত্যা ব্যাপারের এই এক দোষ, এবং এ-ই দস্তুর। এবং এই হাঙ্গামার জন্যেই, অনেকের মনে হত্যাকাণ্ডের সাধ থাকলেও সাধ্য হয় না। হত্যায় সহসা হাত উঠতে চায় না।

কে হত্যাকারী?—এই বইটির হত্যাকারী যে কে তা খুঁজে বের করতে দস্তুরমত সবাইকে বেগ পেতে হবে। যাকে এবং যাকে-যাকে হত্যাকারী বলে সন্দেহ পড়বে শেষটায় দেখা যাবে যে সে নয়। যে লোকটি খুন হয়েছে আর যে গোয়েন্দা এই দুজন ছাড়া প্রায় সবার প্রতিই সকলের সন্দেহ হবে—এবং লেখক হিসাবে সেখানেই আমার বাহাদুরি। এমনকি, এক-এক সময়ে গোয়েন্দার প্রতি সন্দেহ জাগাও কিছু বিচিত্র নয়—বাহাদুরির ওপরে সেটা আরো এক কাঠি। এমন কি, শেষে যদি এমনো মনে হয় যে খুন-হওয়া লোকটাই নিজেকে খুন করেছিল (অথচ সেটা তার আত্মহত্যা নয়) তাহলেও আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হব না।

ডিটেকটিভ বইয়ে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—যদিও বিস্ময়ের বিষয় পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে ছড়ানো থাকে। অবশ্যি, শেষ পর্যন্ত কি যে দেখা যাবে, একজন হত্যাকারীর দেখা পাওয়াও আদৌ বিস্ময়কর নয় সেটা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরে নির্ভর করে—আমার পক্ষে তা বলা সাজে না। তবে একটা কথা আমি বলতে পারি, এবং বলতে চাই, যে যাকে কেউই কিছুতেই সন্দেহ করবে না, করতেই পারবে না—আসলে সে-ই হচ্ছে এই বইয়ের হত্যাকারী। সে হচ্ছে আমি। আমিই এই

বইটিকে হত্যা করেছি, এবং এইজন্যেই আমার এই এজাহার।

ডিটেকটিক গল্প আমি লিখি না। লেখেন আমাদের হেমেনদা—সবাইকার সবচেয়ে প্রিয় হেমেন্দ্রকুমার রায়। আমার হচ্ছে যত হাস্যকর প্রয়াস। তবু কেন যে আমি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই দুঃসাহসিক অপকর্মে লিপ্ত হলাম তার গোড়ায় একটু ইতিহাস আছে। আমার এজাহারের মধ্যে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ হল।

খ্যাতির জন্যে মানুষ কী না করে? খ্যাতির খাতির একটা আলাদা। এমনকি, লেখকরাও চায় তাদের খ্যাতির চৌহদ্দি বাড়ুক। যিনি কবিতা লেখেন তিনি হঠাৎ উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন, আর উপন্যাসকার তাঁর চার পোয়া কীর্তি উপচে উঠে কবিতায় হাত পাকাতে লেগে যান—নিদেনপক্ষে গদ্য কবিতায়। আরম্ভর আর শেষ হয় না, শেষের আড়ম্বরও কিছু কম নয়। এমনই হয়ে থাকে। অতএব আমি তার ব্যতিক্রম হতে পারি না।

তবে, আমার যে খ্যাতি আছে, বা কদাচ তা হতে পারে, এ সন্দেহ আমার কদাপি ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি সে ধারণা আমার টলেছে। একজনের পদাঘাতেই আমার সেই ধারণা নড়িয়ে দিল।

যে যুগে ডাকঘর ছিল না, ভাবো একবার, লেখকদের কী দুঃখটাই না গিয়েছে। নিজেদের খ্যাতির বহর টের পাবার কোন উপায়ই ছিল না তখন। দূর দূরান্তরের পাঠক পাঠিকার কাছ থেকে চিঠিপত্রের ছলনায় নির্জলা সাধুবাদ না এলে লেখবার কি সাধ হয়? লেখার আস্বাদই চলে যায়। তোমরাই বল না! অথচ ভবভূতির কথাই ধর, কিম্বা কালিদাসকেই ধরা যাক। তাঁদের দুঃখের কথা ভাবলে আমাদের দুঃখ হবে। কাঁদতে ইচ্ছে করবে। চিঠি পেতেন না, কিছু না, তবু কোন্ সুখে যে তাঁরা লিখতেন, লিখে লিখে মরতেন তাঁরাই জানেন।

বাস্তবিক, তাঁদের কোন্ বইটা পাঠক সমাজ ঠিক কিভাবে নিল জানবার তখন কোন উপায়ই ছিল না। কেননা, তখন ডাকঘর ছিল না, তাই পাঠকদেরও জানাবার কোন উপায় ছিল না। সত্যি বলতে,

কোন্ লেখক তাঁর পাঠকদের কাছ থেকে দৈনিক কতগুলি চিঠি পেয়ে থাকেন তাই তো তার সাফল্যের নিরিখ। কেবল সম্মান-দণ্ডই না, একমাত্র মানদণ্ডও তাই।

অবশ্যি, ভবভূতির বাল্যকালের চতুষ্পাঠীর প্রাক্তন সতীর্থ কয়েক-জন ছিলই যারা পরমান্ন খেতে পেলে তাঁর লেখার বাহবা দিতে কার্পণ্য করত না, পায়স পিষ্টকের বিনিময়ে চিরদিনই তারা তাঁকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। এবং হয়ত কালিদাসের ভাগ্যও একেবারে মরুভূমি ছিল না। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠীরা, এমনকি স্বয়ং কোনো কাটালও হয়ত, কোন-না-কোন দিন তাঁর পিঠ চাপড়ে বলে থাকবেন, 'লেগে থাকো ছোকরা, চর্চা ছেড়ো না। ভাল হোক মন্দ হোক, লিখে যাও, লেখার অভ্যাস রেখে যাও। কালেক্কে একদিন তুমিও নামজাদা হবে। কিছু আশ্চর্য নয়।'

এমন উৎসাহ লাভ তো আমাদের বরাতেও ঘটে থাকে। আমাদের এলাকার দারোগা, অতদূর না হোক, একজন ডাকপিয়ন সেদিন আমার একখানি বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। দুঃখের বিষয় বইখানি আমার লেখা নয়। কার লেখা তাও জানিনে। এবং চপকাটলেট খাওয়ালে আমাদের বন্ধুরাই বা কোন্ আমাদের লেখাকে মন্দ বলবে? তা সে মনে-মনে যতই শত্রু হোক না! কিন্তু সে কথা তো নয়। কাছাকাছির প্রশংসামাত্রই স্বার্থ প্রণোদিত কিম্বা অর্থহীন। একেবারে অর্থহীন হয়ত নয়, বরং বেশ খরচান্তকর; তবে কিনা, তার কোন মানে হয় না। অজানার, অচেনার এবং সুদূরের সার্টিফিকেটেরই যা কিছু দাম। রবীন্দ্রনাথ কি সাধে বলেছিলেন, 'আমি সুদূরের পিয়াসী'?

এই সুবিধা সেকালের কালিদাস-ভবভূতির ছিল না, আমাদের আছে: ডাকঘর-কল্পতরুর প্রসাদে নব-নব পত্রোদ্গমের এই সুবিধা। এই চিঠি-পাওয়া-পাওয়ি নিয়ে লেখকদের মধ্যে কি কম খাওয়া-খাওয়ি? কিছু কম ঘোরেষি! কোন সাহিত্যিক সঙ্গমে দুজন লেখকের মধ্যে প্রথম আলাপ হয়ত এইভাবেই হয়ে থাকে:

'ওঃ কী যে চিঠিই আসছে আজকাল। পাঠক-পাঠিকাদের প্রশংসার জ্বালায় তো মারা গেলাম! কখন যে অত-অত চিঠির জবাব দেব ভেবে পাইনে, আমার নাবার খাবার ফুরসৎটুকুও নেই। কী করি বল তো? আমার হয়ে গুছিয়ে জবাবগুলো দিয়ে দিতে পারে এমন একজন কাজের লোক দিতে পার আমায়? এই—সেক্রেটারি গোছের?'

'দুঃখের কথা আর বোলো না ভায়া।' দ্বিতীয়জন জবাব দিয়েছেন, 'দুজন সেক্রেটারী ছিল আমার ভাই হে!—কেবল এই কর্মের জন্যেই। কিন্তু বস্তা বস্তা চিঠি এলে তাদের অবস্থা কেমন হয়, বারেক ভেবে দ্যাখো। তাদের আর কী দোষ দেব? আমার কপালের দোষ। আজ সকালে দুজনেই তারা ভেঙে পড়েছে—'

'ভেগে পড়েছে? কী বললে? চিঠির ভয়ে পালিয়ে গেছে নাকি?'

'না, না, পালাবে কোথায়? চিঠির ভয়ে নয়—চিঠির ভারে কোলাপ্‌স্‌! সেই কথাই তো বলছি বন্ধু! দুজনেই তারা এখন হাসপাতালে, আইসব্যাগ মাথায় নিয়ে শয্যাশায়ী। চিঠি তো আকচারই পাই, কিন্তু এত বেশি চিঠি কক্ষনো এর আগে পাইনি। কেন এমন পাচ্ছি বলতে পার?'

প্রথমত জন প্রথমটা একটু ভড়কে গেলেও সামলে নিয়েছেন। এবং বেশ উষ্ণ হয়েই এবার তিনি বলেছেন: 'বটে? গত সপ্তাহে তুমি কতগুলি চিঠি পেয়েছিলে শুনি একবার?'

'তুমি কতগুলি?'

'আমি আগে জিজ্ঞেস করেছি।' প্রথমোক্ত লেখক বলেছেন—'আগে তার জবাব দাও।'

এবং তারপর, আর কোন জবাব নয়, পরস্পরকে তাঁরা জবাব দিয়েছেন—হয়ত জন্মের মতই। যাঁরা লেখকদের উৎসাহিত করার অভিপ্রায়ে চিঠি দেন তাঁরা সম্ভবত জানেন না যে ঐ চিঠি নিয়ে আড়াআড়ি করতে গিয়ে কত সুহৃদের চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে

যায়। ভগবান, তুমি এই চিঠিদাতাদের মার্জনা কোরো, তারা জানে না তারা কী করে—চিঠি দিয়ে নিজের অগোচরে কী সর্বনাশ করে তারা জানে না।

তবে, আমিও কি কারো চিঠি পাইনে? পাই বই কি। কখনো যে পাইনি, তা বলা যায় না। অল্প-বিস্তর পেয়ে থাকি—আমিও। সত্যি বললে বলতে হয়, অল্পের দিকটা একেবারে অত্যল্প নয়, মানে—শূন্য নয় একেবারে; আর বিস্তরের দিকেও তেমনি বেশী বিস্তার নেই। প্রায় মাঝামাঝি। আমার বই যারা পড়ে তারা নিতান্তই পাঠক—লেখার তারা কোন ধার ধারে না, এইরূপ আমার ধারণা। হয় তারা চিঠিপত্র লিখতে ভালবাসে না, অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র মনে করে, কিম্বা লিখলে, পত্রলেখক না হয়ে একেবারেই পত্রিকার লেখক হতে চায়, নয়তো লেখার তেমন কোন সুযোগ তাদের নেই। প্রথমত, মন খারাপ হলে লোকে আমার বই নিয়ে পড়ে, এই রকম শুনেছি। তখন কি আর চিঠি লিখতে মন যায়? তারপর জেলখানার কয়েদীরা আমার বই পড়তে ভালবাসে, কিন্তু তাদের চিঠিপত্র লেখার সুযোগ কম। পকেটমাররাও নাকি আমার বই পড়ে বলে শুনে থাকি। আমার লেখা পড়ে পড়ে তারা নাকি চোখা হয়, চৌকস হয়! নিত্য-কর্মে বেরুনোর আগে কাঁচির সঙ্গে শিব্রাম্ চক্রবর্তীর একখানা বই নিয়ে তারা বেরোয়। যেদিন এর অন্যথা করে সেদিন হয় তারা কারো পকেট ধরতে পারে না, নয় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আবার এও শুনি, পাশ করার ছেলেমেয়েরা আমরা সবাই বই পড়ার জন্যে ফেল করে ফেলেছে। তারপরে ফেল করার দুঃখ ভুলতে আবার তাদের আমার বই নিয়ে পড়তে হয়েছে। এবং তারপরে তার ফলে আবার—পুনঃ-পুনঃ—যাকে ইংরেজিতে পাপচক্র না পাকচক্র কী যেন বলে থাকে। কিন্তু একথা আমার বিশ্বাস হয় না—একাধারে শক্তি-শেল এবং বিশল্যকরণী—এতদূর ক্ষমতা আমার বইয়ের আছে আমি বিশ্বাস করিনে। এমনকি, যেসব ছেলেমেয়েরা আমার বই পড়ে, আমার বই ছাড়া আর কিছুই পড়ে না, তারা কিছু না পড়েই পাশ

করতে পারে, এই জনশ্রুতিও একান্ত অলীক এবং অবিশ্বাস্য বলে আমার মনে হয়।

হ্যাঁ, চিঠি পাবার যে কথা বলছিলাম। আমিও চিঠি পেয়ে থাকি—নিতান্ত কম নয়। একের পিঠে অনেকগুলি শূন্য যোগ করলেই তার ইয়ত্তা হবে। শূন্যগুলি এখনো শূন্যেই রয়ে গেছে এই দুঃখ, আপাতত আমি একখানাই পেয়েছি। এতদিনে সেই একখানাও যে আমার কোন গুণমুগ্ধ পাঠিকার, সে কথা হলফ করে বলা যায় না।

চিঠিখানি 'শিবরাম চক্রবর্তী—কলকাতা' এইরূপ বিরাট ঠিকানা বহন করে এসেছিল। তবু যে এসে পৌঁছেছিল, এ-র মূলে আমার খ্যাতি কি ডাকঘরের কেরামতি কী আছে জানিনে। আমার মনে হয় এই কৃতিত্ব আমার অনুরাগী বন্ধু সেই ডাকপিয়নের—তাঁরই কীর্তি।

যাই হোক, নাগা পাহাড় থেকে আসা সেই চিঠিখানি এইরূপ ঃ

মাই ডিয়ার চক্রবর্তীবাবু,

মণিপুরের ইস্কুলে পড়তে একটি বাঙালী মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। তার মুখে আপনার কথা শুনেছিলাম। আপনার ভাষায় নাকি ভারি অলঙ্কার, সে বলত। আমরা নাগা মেয়েরা সাধারণত আমাদের জাতীয় গয়না গায়ে পরি—কিন্তু তা পরতে আমার ইচ্ছা করে না! সেগুলো পরা ভারি কষ্টদায়ক। আমার বাবা, তিনি এখানকার নাগাদের সর্দার, বলেছেন আমার সেই বাঙালী বন্ধুর মত অলঙ্কার আমাকে কিনে দেবেন। অতএব আপনি অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র পারেন আপনার সমস্ত অলঙ্কারের একখানা তালিকা পাঠিয়ে সুখী করবেন। অলঙ্কারগুলির দামও জানাবেন দয়া করে। ক্যাটলগ ভি-পি করে পাঠালে ভাল হয়। ইতি—

একান্তভাবে আপনারই

কুমারী নিন্ ফ্যাচাঙ

ঐ চিঠি পাবার পর অনেক দিন আমার ঘুম হয় নি। ওর কি জবাব হতে পারে, কী জবাব দেব, আমি ভেবে পাই নি। এখন অবধি আমাকে, বাধ্য হয়েই, নিরুত্তর থাকতে হয়েছে।

রচনাগত আমার যাবতীয় অলঙ্কার, (যদি সত্যিই কিছু থাকে) তালিকাবদ্ধ করে পাঠাতে হলে আমার পুরো এক সেট বই-ই পাঠাতে হয়। বই থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে আঠা দিয়ে সেঁটে তাদের গায়ে লাগানো যাবে না যে তা নয়, কিন্তু তেমন অলঙ্কার নাগাদের মুল্লুকেও কেমন জনপ্রিয় হবে আমার জানা নেই। দুনিয়ার হাল চাল, সেইসঙ্গে ফ্যাশনও, আজকাল এমন উড়ুক্কু বোমার বেগে বদলাচ্ছে যে তাল রাখা মুস্কিল।

তারপর এই সেইদিনের কথা কই। আমি যে কতদূর বিখ্যাত লেখক এর থেকে তার পরিচয় পেলাম। তোমরাও সেটা পাও— সেইজন্যেই আমার বলা।

কফি হাউসে সেদিন একলা এক কোনে বসে আপন মনে কফি পান করছি, এমন সময়ে একটি অচেনা মেয়ে আমার সামনের কৌচে এসে বসল। সদ্য-কলেজে-ওঠা কোনো মেয়ে। আমার অচেনা হলেও আমি তার বেশ চেনা, তার হাবভাব থেকে এই রকম আমার মালুম হল।

'কী ভাগ্যি আমার! এমন করে এখানে আপনার দর্শন পাব এরকম আশা করিনি!' বলল সে।

এর জবাবে 'আমারো কী ভাগ্যি!' এই জাতীয় কোন কথা বলাই বোধহয় উচিত ছিল, কিন্তু বলব কি, সহসা ঐভাবে আক্রান্ত হয়ে অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কোন কথাই সরল না।

'তা বটে।' বললাম আমি অবশেষে।

'আজ আমার জীবনের কী শুভ লগ্ন! আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে তা বলতে পারি না! এক মুখে তা বলা যায় না! আপনার প্রত্যেকটি লেখা আমি মন দিয়ে পড়ে থাকি! এবং একবার নয়— তা জানেন?'

'জেনে খুব খুশি হলাম। তবে, একটা কথা জিজ্ঞেস করি যদি কিছু না মনে করো। তুমি কি পরীক্ষায় ফেল করেছ নাকি?'

'কক্ষনো না! আমি কেন, আমাদের বাড়ির কেউ কখনো কোন পরীক্ষায় ফেল হয়নি। আমি না, আমার দিদি নয়, আমার দাদারা না—ভাইরাও নয়। আমার দিদি আপনার বই পড়তে কী ভালই যে বাসেন!'

'খুব মনঃকষ্ট বুঝি তোমার দিদির? সব সময়েই মন খারাপ হয়ে থাকে—তাই নাকি?'

'তা কেন? খুব ফুর্তিবাজ মেয়েই তো! আমার দাদাও আপনার লেখার ভারি ভক্ত। তিনি আলিপুরে থাকেন।'

'ও! জেলখানায়? বুঝেছি।'

'না, জেলে কেন? সেখানকার এক সরকারি অপিসে বড়ো দরের কী কাজ করেন তিনি!'

'বটে? ভারি আশ্চর্য তো!' আমার নিজেরই আশ্চর্য লাগে এবার।

'আপনার বই পড়তে বসলে আমাদের আহার নিদ্রা ঘুচে যায়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। আর এমন রোমাঞ্চ হতে থাকে যে কী বলব! আপনার মত ডিটেকটিভ বই আর কেউ লিখতে পারে না…'

'কিন্তু আমি তো ডিটেকটিভ বই লিখিনে ভাই'—বাধা দিয়ে বলতে যাই। কিন্তু কে শোনে? আমার বাধা অগ্রাহ্য করে মেয়েটি বলেই যায়—'উঃ, আজ কী মজাটাই না হবে! বাড়ি ফিরে মাকে দিদিকে আর আমার ভাইদের বলব যে কফি হাউসে কার সঙ্গে এক টেবিলে বসে আজ খেয়েছি জানিস? শুনলে তোদের চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠবে! বলব যে, আর কেউ নয়, খোদ আমাদের শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়!

অবাঞ্ছনীয় উপসংহার

'খুন! জখম! রাহাজানি! হেল্‌প্‌! হেল্‌প্‌!' শীতের দুপুর-হলেও সানি পার্কের দিকটা জনবিরলই একটু। নির্জন রাস্তায় একমাত্র চিরঞ্জীববাবুই ওভারকোট-আবৃত হয়ে রৌদ্র-সেবনে বেরিয়েছেন। এহেন সময়ে, কাছাকাছি একটা দ্বিতল থেকে একম্বিধ আর্তনাদ শুনতে পেয়ে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল।

গলা খুব কড়াও নয়, খুব মিঠেও নয়,—খুব চড়াও না, খুব মোলায়েমও না,—পুরুষ কি নারীর ধরা শক্ত। চিৎকার খুব তীব্রও নয়—অনেকটা যেন চাপা গলার—কিন্তু চিরঞ্জীববাবুর শোনবার পক্ষে যথেষ্টই।

চিরঞ্জীব দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, কী করা যায়। খুন, জখম, রাহাজানি—এতগুলো মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখে একক আপনাকে তাঁর একান্ত অসহায় বলে ধারণা হল। কোন্‌টাকে রেখে কোন্‌টাকে সামলাবেন? তবে এও হওয়া সম্ভব, ওর একটারই ধাক্কা, তিনটের নয়,—কিন্তু সেই একটার ধাক্কাতেই, বিপন্ন ব্যক্তি এমন মাথা গুলিয়ে ফেলেছেন যে ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারেন নি।

যাই হোক, এগোনো দরকার; সাহসের সঙ্গেই সম্মুখীন হওয়া উচিত। অবশ্য চিরঞ্জীববাবুর দ্বারা যথার্থই কতটা সাহায্য হতে পারে সে-সম্বন্ধে নিজের মনেই ঘোরতর সংশয় ছিল; তবু অনেক সময়ে, সাহায্যের অভিনয়েই সাহায্যের কাজ হাসিল করে, উপকার না করেও অপকারীর উপরে টেক্কা মারা যায়। তাঁর যা বাহুবল, তাতে একটা মাছিও তিনি তাড়াতে পারবেন কি না সন্দেহ, তবু তাঁর ঐ লম্বশার্ট-পটাবৃত বিপুল বহর, ঐ ওভারকোট-আচ্ছন্ন মুশকো চেহারা, এ দেখেই হয়ত গুণ্ডারা ভড়কে গিয়ে হাতের কাজ ফেলে

রেখে সট্‌কে পড়তে পারে।

এমনও তো হয়, হয় না কি? চিন্তাতুর চিরঞ্জীব ভেবে দেখেন, এবং প্রায় পা-খানেক এগিয়েছেনও, এমন সময়ে আবার সেই ভয়ার্ত কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল :

'নরহত্যা! রক্তারক্তি! দাঙ্গাহাঙ্গামা!···হেল্‌প্‌!'

চিরঞ্জীব চমকে উঠলেন, তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হল আবার! অবশ্যই, যখন সাহায্য করতে এগিয়েছেন তখন রক্তারক্তির জন্যে তৈরি হয়েই এগিয়েছেন—খানিকটা রক্তারক্তি এসব ব্যাপারে হয়েই থাকে—অনিবার্যভাবেই হয়ে যায়; এবং নরহত্যার জন্যেও তিনি নিতান্ত অপ্রস্তুত ছিলেন না—খুনোখুনি কাণ্ডে অমন এক-আধটা বাজে খরচ হয়ই, না হয়েই পারে না, সে আর এমন বেশি কী? কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা? দাঙ্গা-হাঙ্গামার তাল কি তিনি সামলাতে পারবেন? গিধধড় ওভারকোট এবং কেবলমাত্র গায়ের জোরে কি তাতে খুব সুবিধে করা যাবে? এ ধরনের ইলাহি বিলাসিতায় যারা যোগ দেয় তারা তো হতাহতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যেই মাথা গলায়—খবরের কাগজে প্রত্যহ প্রকাশিত তালিকা থেকেই তা জানা যায়। কিন্তু সেভাবে যোগদান কি তাঁর পক্ষে সম্ভবপর? ···যদি হাতাহাতিই করতে হয় নেহাৎ?

বিচলিত চিরঞ্জীব কী করবেন ভেবে পান না। তাঁর নামটা কিংবা ওই নামের ইঙ্গিতটাই যে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যোগ দেবার মস্ত বিপক্ষে, ঠিক তা নয়, আরও, হ্যাঁ—তাও ছাড়া আরও বিশেষ বাধা ছিল, যা যে কারণেই হোক, প্রকাশ করতে তিনি নারাজ।

চিন্তিত চিরঞ্জীব অসহায় দৃষ্টিতে ওপরের দিকে তাকান। না, বিধাতার দিকে নয়, দোতলার প্রতিই তাঁর দৃকপাত। বাড়ির দ্বিতলে যখন দারুণ ব্যাকুলতা—খুন, জখম, রাহাজানি, নরহত্যা এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব একসঙ্গে তালগোল পাকিয়েছে—ধস্তাধস্তির সঙ্গে রক্তারক্তি মিশে সে এক বিতিকিচ্ছি ব্যাপার—ভারি বিশ্রী পরিস্থিতি—সেই সময়ে—সেই প্রচণ্ড দুঃসময়ে—বাড়ির সদরে দাঁড়িয়ে চিরঞ্জীবের বিহ্বল

বিকল অবস্থা।

ঘণ্টাখানেক আগে পুলকেশ ইয়াঙ্কি মুলুকের খোকা গুণ্ডার কাহিনী পড়ে শেষ করেছে। ছেলেদের মাসিকখানা তার হাতেই ছিল তখনো। তখন থেকেই সে ভাবছে। ভাবছে, খোকা সে তো আছেই, তবে, তবে—গুণ্ডা হতে তার বাধা কী? দোষটাই বা কোন্‌খানে? গুণ্ডামি এবং চ্যারিটি প্রায় সগোত্র। অতএব নিজের বাড়ি থেকেই ওদের সূত্রপাত হওয়া উচিত। পুলকেশও কাকার ক্যাশ-বাক্সটার দিকে একবার যে তাকায় নি তা নয়। ভাল করেই তাকিয়েছে, এবং পুঁচকে পাঁচ পয়সা দামের পটকা তালাটাও তার নজর এড়িয়ে যায় নি। দু-পাঁচশোর কম কি হবে ওই বাক্সটায়? মনে মনে আন্দাজ পাবার চেষ্টা করেছে সে।

তা, বেশ একটু বড়লোকই বটেন তার কাকা। কিন্তু তিনি যা বড়লোক, তারও বেশি—একটু—একটু, ঐ যাকে বলে—কঞ্জুস। পাঁচশো টাকা পুঞ্জীভূত আছে যে বাক্সে তার তালাটার দিকেই তাকিয়ে দ্যাখো না। ওই পুঁচকে তালাটাই তো জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। বাক্সর ভেতরের পাঁচশো টাকার ততটা কি, যতটা তার কাকার মিতব্যয়িতার?

ওর কাকার কার্পণ্যের আরও উদাহরণ চাও? এই সেদিনই তিনি যে পিস্তলটা কিনে এনেছেন, পড়তা চোর-ছ্যাঁচড় তাড়ানোর মতলবেই —নাঃ, সে পিস্তলের কথা না তোলাই ভাল! মনে মনে উচ্চারণ করতেও পুলকেশের লজ্জা হয়। হ্যাঁ, পিস্তলই বটে সেটা, আকারে প্রকারে, কিংবা, আচারে ব্যবহারে—না, কোথাও কিছুমাত্র ত্রুটি নেই; আওয়াজও হয়, এবং গুলিও বোধ হয় বেরোয়,—তবু তবু, সেই পিস্তলেও হাত দেওয়া তার বারণ পাছে দু-চারটে বাজে গুলি বরবাদ করে ফেলে, সেইজন্যই হয়ত বা।

এদিকে পুলকেশের রাস্তার মোড় দিয়ে হাঁটাই মুস্কিল। সমরেশ তো তাকে দেখতে পেলেই ছিঁড়ে খাচ্ছে। অর্ধেক দাম দেবার কড়ারে তার সঙ্গে সহযোগে একগাদা ডিটেকটিভ বই কেনা হয়েছিল, সেও হয়ে গেল প্রায় সতেরো মাস—কিন্তু একটি পয়সা দেবার তার নামটি

নেই। একটি পয়সায় কি চোখে পড়তে পাচ্ছে পুলকেশের, যে নাম করবে ?

নামোচ্চারণ কি অত সোজা ! পড়তে বাপু এমন কাকার পাল্লায়, টের পেতে তাহলে। পয়সা কি করে কমাতে হয়, শিখতে কি না বলা শক্ত, কিন্তু কি করে যে কমাতে হয় উল্টে তাই ভুলে যেতে বেমালুম। বাড়ির বাজার সরকার কাকা, রাঁধুনি বামনি স্বয়ং কাকি, ঠিকে ঝি বাসন মেজে দিয়ে যায়, আর ফাই-ফরমাস খাটে—? নাঃ, তার নামটা পুলকেশ তোমাদের জানাতে পারবে না।

এই তো, আজ হঠাৎ ম্যাটিনির খান-দুই পাশ পেয়ে কাকা আর কাকি সিনেমায় চলে গেছেন—তাকে যে সঙ্গে নেন নি তার কারণ এ নয় যে পাশের মাত্রা আর কিছুমাত্রও বাড়ানো যেত না, তাকে রেখে যাওয়া হয়েছে বাড়ির জিম্মায়। কেন বাপু, এতই যদি টাকা-কড়ির জন্যে ভাবনা, একটা দারোয়ান রাখতে কে মানা করেছে? ঠিক-ঠিক বেতন পেলে পুলকেশই হয়ত সেই পদের জন্যে আবেদন করতে পারে। কিন্তু এ রকম অবৈতনিক দারোয়ানগিরি তা বলে কিছুতেই আর হজম করা যায় না।

বেশ, ভাল করেই পুলকেশ বাড়ি আগলাবে আজ। বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করে ছাড়বে সে। কাকার পিস্তল দিয়েই ওই পটকা তালাটার মাথা খাবে, বাক্সটাকেও নিকেশ করবে। পিস্তল-পেটা করেই সব লেঠা চুকোবে আজ। রাস্তার মোড় ধরবে সে তারপর, তবেই তার নাম খোকা গুণ্ডা নম্বর টু।

পুলকেশ মাসিক পত্রখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পিস্তলটাকে কাকার ড্রয়ার থেকে বার করলে।

কিন্তু তালাটাকে পিস্তলঘাত করবার মুহূর্তেই তার মনে খটকা বাধল একটা। বাক্স ভাঙলে তার হাড়গোড় আস্ত থাকবে কি না, এই ধরনের একটা সন্দেহজনক জিজ্ঞাসার উদয় হল হঠাৎ। কেননা তার কাকা বাড়ি ফিরবেন নির্ঘাৎ, অনিবার্যভাবে। অবশ্যম্ভাবীরূপেই নিশ্চিত। সিনেমা যতই চমৎকার আর উপাদেয় জিনিস হোক না,

তাও শেষ হয়—এবং শেষ হয়ে গেলে কাকা আর একদণ্ডও সেখানে টিকে থাকার প্রয়োজন বোধ করবেন কি না সন্দেহ।

তার চেয়ে—তার চেয়ে এ-রকমটা করলে হয় না?

জানালার থেকে উঁকি মেরে ওভারকোটওলাকে তথাপি ইতস্তত করতে দেখে পুলকেশ এবার গলা বাড়িয়ে ডাক ছাড়লে ঃ

'মেরে ফেললে! মেরে ফেললে! কে কোথায় আছ, বাঁচাও এসে!'

এবং একটা কাঁচের ফুলদানি নিয়ে ছুঁড়ে দিলে দেয়ালের বিরুদ্ধে—বেশ সজোরেই ছুঁড়ে দিলে। তার নিজস্ব চাঁছাছোলা গলার সঙ্গে মিলিয়ে ছত্রভঙ্গ কাঁচের ঝঙ্কার মন্দ ঐকতান হল না।

চিরঞ্জীব ঘরে ঢুকে বিস্মিত হয়ে গেলেন। একটি বালক এবং কতকগুলি ভগ্নাংশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। আরও আশ্চর্য এই যে, ভগ্নাংশ-গুলো আবার সেই বালকের নয়। বিস্মিত হবার কথাই বই কি!

'কই, খুনে ডাকাতরা কই? গুণ্ডারা—?' চিরঞ্জীববাবু প্রশ্ন করলেন ঃ 'আমি আসবার আগেই পালিয়ে গেল সব?'

হতাশাব্যঞ্জক হাসি হাসলেও মনে মনে অনেকটা স্বস্তি পেলেন তিনি।

'না। একজন রয়ে গেছে এখনো।'—বলতে বলতে পিস্তলটা তুলল পুলকেশ ঃ 'আমিই রয়েছি। এই যে পিস্তল। দেখতে পাচ্ছ না পিস্তলটা?'

'ও? পিস্তল? তাই তো বটে!' চিরঞ্জীববাবু ঈষৎ হকচকিয়েই যান, কিন্তু নিজেকে সামলে নিতেও তাঁর খুব দেরি হয় না। 'পিস্তলই তো বটে। চিনতে ভুল করি নি। সেই কবে প্যালেস্টাইনের যুদ্ধে গেছলাম—তার পরে ওসব যন্ত্রপাতি তো চোখে পড়ে নি আর! বহু-দিনই চোখে পড়ে নি। তা, কী করতে হবে আমায়? হাত তুলে দাঁড়াতে হবে নাকি? তা হলেই তো হয়েছে! ও সব হাত-টাত তুলে রাখা আমার কর্ম নয়, বাপু! ও-ধরনের অভিনয় করা আমার আদপেই পোষায় না।'

'বশ, হাত তুলতে হবে না। কিন্তু যা কিছু তোমার পকেটে আছে ঝেড়ে ফেল দিকি বাছাধন!'—ডিটেকটিভ বইয়ে পড়ার মত হুবহু আউড়ে যায় পুলকেশ।

'আমার পকেটে? তুমি নিজেই হাতড়ে দেখতে পার। আমাকে আর অনর্থক কষ্ট দেয়া কেন?' মৃদু হাস্য করে বলেন চিরঞ্জীব।

'হ্যাঁ, আর তুমি সেই তক্কে ধরে ফ্যালো আমাকে? বেশ আর কী!'

'তাহালে তোমার পিস্তল রয়েছে কী করতে?'

'হ্যাঁ, পিস্তল আছে বটে।' অপ্রস্তুত হাসি হেসে, দুঃসাহসভরে এগিয়ে যায় পুলকেশ, কিন্তু ওভারকোটের কাছাকাছি গিয়েও তার ভেতরে হাত পুরবে কি না ইতস্তত করতে থাকে।

'ভয় নেই। একটা আঙুল দিয়েও তোমাকে আমি ঠেকাব না। মাভৈঃ! চিরঞ্জীব ভরসা দেন আমি এক কথার মানুষ। আমার যে কথা সেই কাজ।'

পিস্তলের নলটা আগন্তুকের বুকে বিন্যস্ত রেখে, পুলকেশ অন্য হাতে শশবাস্তে সব পকেটগুলো হাতড়ে নেয়। কিন্তু না, কানা-কড়িটার পর্যন্ত পাত্তা নেই কোথাও।

'একটা পয়সা নেই পকেটে, ধোকড় ওভারকোট গায়ে দিয়ে বেরুনো হয়েছে বাবুর!'

অন্তর্গত যাবতীয় পুলকেশ এক বাক্যে বহির্গত করে ফেলে।

ম্লান হাসি হাসেন চিরঞ্জীবঃ 'বিধাতার মার। বুঝলে বাবা-জীবন! অপরকে হাত তুলে দুটো যে পয়সা দেব, সে সুখ কি দিয়েছেন বিধাতা? সে ক্ষমতাই দেন নি আমায়! তাহলে তো পকেট-ভর্তি পয়সা দিয়ে বেরুতাম রাস্তায়, যে চাইত তাকেই দিতাম, যেনা চাইত তাকেও। তোমাকে কি আর এত কাণ্ড করতে হত তাহলে?

দীর্ঘনিশ্বাস—বেশ লম্বাচাওড়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে যায় তাঁর।

'যাও যাও! আর ইয়ার্কি করতে হবে না! ভারি কঞ্জুসের ধাড়ি কোথাকার! এমন চমৎকার যার ওভারকোট তাঁর নাকি

আবার পয়সা নেই! কেবল আমাকে ঠকাবার মতলবেই ট্যাঁক খালি করে বেরুনো হয়েছে—বুঝেছি। কাকা নম্বর টু,—দূর, দূর!'

চিরঞ্জীব কিন্তু দূরীভূত হল না পুলকের বক্তৃতা শুনে, পাশের একটা চেয়ারে আরাম করেই চেপে বসল।

'তোমার অসুবিধেটা আমি বুঝতে পারছি বাপু! কিন্তু আমি তো নাচার। বল, আর কী ভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি আমি? বলে ফ্যালো, লজ্জা কীসের?

'থাক, আর কথায় কাজ নেই! আমার কাজ আমি নিজেই গুছিয়ে নিতে পারব, আপনাকে আর বাধিত করতে হবে না!'

এই বলে পুলকেশ পিস্তলটাকে আরো ভাল করে বাগিয়ে ধরে। 'চুপ করে বসে থাকো ঐ চেয়ারে, নড়েছ কি—দুড়ুম!'

তারপরে টেবিল থেকে ছোট ক্যাশ-বাক্সটাকে তুলে ধরে সজোরে আছাড় মারে মেঝেয়। আবার, এবং তারপর আবার।

বারম্বার বেমক্কা মার সইতে না পেরে বাক্সটা তার যা-কিছু পুঁজি-পাটা চিৎকার করে বার করে দেয় তক্ষুনি। পিস্তলের লক্ষ্য উদ্যত রেখেই পুলকেশ বামাল সামলে নিয়ে পার্শ্ববর্তী খাটের গদির তলায় পুঞ্জীভূত করে রাখে।

চিরঞ্জীব নিষ্পলক নেত্রে সমস্ত কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করেন। তাঁর দৃষ্টি সধুবাদে মুখর।

'বাঃ, বেশ, বেশ! তোমার হাত-সাফাই আছে বটে! কালেক্কে লায়েক হতে পারবে।'

'চুপ! একটি কথা না! টুঁ করলেই গুড়ুম!'

পুলকেশ নিজের চুলগুলো হেস্তনেস্ত করে ফেলে ব্রাশ-করা পরি-পাটি চুলে হস্ত ন্যস্ত করলে স্বভাবতই যা হয়ে থাকে। তারপর চুল-গুলো উসকো খুসকো করে তারপরে এক হ্যাঁচকায় গায়ের শার্টের দফা সারে—একেবারে ফর্দাফাই বলে যাকে। এহেন ক্ষেত্রে যা যা করবার, ডিটেকটিভ বই পড়ে সবই তার জানা—কিছুই তার আটকায় না, কর্তব্যের কোনটাই বাদ যায় না।, নিখুঁতভাবেই হয়ে যায় সব।

তারপর নিজের—হ্যাঁ,—নিজের গালেই যথাসাধ্য সজোরে এক চপেটাঘাত কষিয়ে, টেলিফোনের রিসিভারটা সে তুলে নেয়ঃ 'হ্যালো—লালবাজার—!'

চিরঞ্জীববাবু প্রতিবাদের সুরে বলেনঃ 'দেখ, এটা কি ভাল হচ্ছে ঠিক? ···শেষটায় মুস্কিল বাধানো···আমাকে দোষ দিতে পাবে না কিন্তু···'

কোন কথা কানে তোলে না পুলকেশ। —'হ্যাঁ, চলে আসুন চটপট—খুন, জখম, রাহাজানি···আমাদের বাড়ি···!'

পুলিশের গাড়ি এসে পড়তে আর কতক্ষণ? দারোগা ঘরে ঢোকবার আগেই সে পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলেছে চিরঞ্জীবের দিকে এবং রোগা ছেলেটির মত নেতিয়ে পড়েছে বেতের চেয়ারটায়।

চিরঞ্জীব চুপ করেই থাকেন। তাঁর মুখে ম্লান মৃদু হাস্য—চোখে সহানুভূতির সুস্পষ্ট চিহ্ন।

পুলিশ যথাসময়ে হাজির—সদল বলে।

পুলিশকেই সব বলে। কাকা-কাকিমা সিনেমায় গেছেন, তাকে বাড়িতে একলা পেয়ে এই ওভারকোটওলা গুণ্ডা ভদ্রলোকটি কোত্থেকে না এসে, ঐ পিস্তলটা দিয়ে ভয় দেখিয়ে কাকাবাবুর ঐ হাতবাক্স ভেঙে যা কিছু ছিল—কী ছিল তার জানা নেই, তবে টাকা-কড়ি ছিল অনেক—বেবাক সব হাতিয়ে নিয়েছে। নিয়ে আপনাদের আসার অপেক্ষায় পিস্তল ফেলে দিয়ে ভাল মানুষ সেজে চুপটি করে এখন বসে আছে চেয়ারে। দেখুন না ঐ!'

যথার্থই। দেখার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। ভাল মানুষ-সাজা গুণ্ডাটি তো সামনেই সমাসীন; উদাসীনভাবেই উপবিষ্ট; বাক্সটাও, 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট' অবস্থায় হাঁ করে; এবং পিস্তলটাও পড়ে রয়েছে মেঝেয়। কোনটারই ইতরবিশেষ নেই, বর্ণনার সঙ্গে দৃষ্টান্তের গোল নেই কোন—হাতে-নাতেই সব প্রমাণ হয়ে রয়েছে।

পুলিশের দারোগা গম্ভীর মুখে পিস্তলটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করেনঃ 'মশার রিভলভারই দেখছি। দোনলা মশারই বটে।'

'ঠিক ধরেছেন মশায়।'

চিরঞ্জীববাবু এতক্ষণে কথা বলেন একটা: 'মশা-মারা পিস্তলই বটে।' যুদ্ধ-ছাড়া অবশ্যব হুদিন; কিন্তু তা হলেও চিনতে আমি ভুল করিনি।'

পুলকেশ সলজ্জ হয়ে ওঠে: 'ওটা যে টয় রিভলভার আমি কি তা জানি? আমি কি করে জানব? আমার কী দোষ? আমি সত্যি ভেবেই ভয় খেয়েছি।'

দারোগার গোঁ বেড়ে যায় আরো। চিরঞ্জীববাবুকে লক্ষ্য করে তিনি বলে ওঠেন, 'আপনাকে সেজন্যে মাথা ঘামাতে হবে না মশাই, সে আমরা বুঝব। বলে কত ভাঁড়কেই বোমা বলে চালিয়ে দিলাম, সামান্য এটাকে আর মশার বলে চালাতে পারব না। হাকিমদের কাছে কী না চালানো যায়? অ্যাঁ? আদালত বলেছে কেন তবে? সে সব ভাবনা রেখে দিয়ে, এখন এই ব্যাপারে আপনার কী বলবার আছে বলে ফেলুন দেখি চটপট!' তাড়া দেন দারোগা।

'আমার? আমার বলবার আর কী আছে? আমি আর কী বলব? এর কোন ব্যাপারেই আমার কোন হাত নেই, এইটুকুই আমি বলতে পারি।' চিরঞ্জীব পুলকেশের দিকে একটা করুণ কটাক্ষ করে সবিনয়ে নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করেন। 'হ্যাঁ, শুধু এইটুকু।'

'বটে? আপনার কোন হাত নেই? বলবেনই তো—!' পুলকেশ ঝাঁপিয়ে ওঠে শোনামাত্রই: 'বলুন! আপনি আমার জামা ছিঁড়ে দেন নি? আমার চুল ধরে টানেন নি? বলুন! আমার গালে ঠাস-ঠাস করে তিন চড় কষিয়ে দেন নি? বলে যান! বলে যান বেমালুম! কী মিথ্যুক রে বাবা!'

চিরঞ্জীব হেসে ফেললেন: 'সত্যি যদি সুযোগ থাকত তাহলে এক্ষুনি তিন চড় কষিয়ে দিতুম। কিংবা তোমায় মাথায় তুলেই নাচতুম কি না কে জানে। কিন্তু—'

'হাতকড়ি লাগা দেও—কেয়া দেখ্‌তা হ্যায়? লে চলো থানামে!' দারোগা হুকুম দেন কনেস্টবলদের, হুমকিও দেন।

একজন পাহারিওয়ালা হাতকড়ি তুলে ধরে,—আর একজন ওঁর ওভারকোট খুলে ফেলে; কিন্তু হায়,—হাতকড়ি লাগানোর কোন উপায় দেখা যায় না।

ভদ্রলোকের দুটো হাতই কাটা। কাঁধ থেকেই কাটা একদম।

হর্ষবর্ধণের টোটকা

সেই সাতসকালে—তখনো আমি ধরাশায়ী, ধরাশায়ী ঠিক না হলেও ধরণীর সঙ্গে সমান্তরালে বালিশের ধরাবাঁধার ভেতরে বিছানার ওপরেই শায়িত—শ্রীমান গোবর্ধনচন্দ্র এসে হাজির।

'এই যে গোবরা ভায়া! কি মনে করে এই সাত-সকালে হঠাৎ?'

'সাতসকাল নয় এখন, সাড়ে আটসকাল।' হাতঘড়ি দেখে সে বাতলায়, 'দাদা ডেকেছেন আপনাকে। ভারী জরুরী দরকার। চলুন।'

'কি দরকার?'

'হাত ব্যাথা করছে দাদার।'

'তাই নাকি?' তা পা ব্যাথাও করেছে নাকি তার?

'না, পায়ের কিছু হয়নি এখনও পর্যন্ত।'

'পা যখন ভাল আছে, তখন তার নিজের আসতে বাধাটা কি হোলো? দেখ ভাই, আমি তো এখনো ঘুম থেকে উঠিনি, হাফ ঘুমুচ্ছি। সারারাত এপাশ-ওপাশ করে এমন ক্লান্ত যে, হাঁফ ছাড়বার ফুরসৎ পাইনি এখনো। এমতাবস্থায় এই সাড়ে আটসকালে কি করে ওই চেতলায় যাই? আর কি করেই বা আমার উচ্চরক্ত-চাপ নিয়ে তোমাদের তেতলায় উঠি গিয়ে? এই বয়সে অমন চাপল্য কি শোভা পায় আর আমার? বলো।'

'আমি কি বলব! দাদার হাত ব্যাথা করছে যে—'

'শুনে শুনে আর স্থির থাকতে পারি না বিছানায়' তিড়বিড়িয়ে লাফিয়ে উঠি। এক কথা সাতবার শুনতে ভালো লাগে না আমার।

'হাত ব্যাথা তার আমি কি করব?' চাড় দিয়ে উঠি, উঠে গায়ে শার্ট চড়াই বলি, 'দেখাতে হবে ডাক্তারকে।'

'দাদা বললেন যে, আপনি লেখক মানুষ, কলম চালিয়ে খান আপনি···তাই···'

'কলম তো হাতের কী!' আমি বাধা দিয়ে কই!

'আহা, ঐ হাতেরই ব্যাপার তো! হাত নড়লে তবে তো কলম নড়ে। তাই দাদা বললেন যে, উনি হাতের বিষয়ে হয়ত বিশেষজ্ঞ হবেন, কোনো টোটকা দাবাই-টাবাই জানা থাকতে পারে আপনার। সেই কারনে—

'চলো যাই।' আমি আর কথা বাড়াই না--ওদের মোটরে উঠি গিয়ে—সটান গিয়ে দাঁড়াই সেই চেতলায়।

'কি ব্যাপার?'

'কী যে হোলো আমার এই হাতটার মশাই!' হর্ষবর্ধন কন বিমর্ষভাবে।

'রামডাক্তারের কাছে যান না। দেখান না তাঁকে।'

'ও বাবা!' শুনেই তিনি তুবার চমকান, 'ওই হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে? তাহলে আর আস্ত থাকবে না এই হাত—প্ল্যাস্টার বেঁধে ছেড়ে দেবেন নির্ঘাত!'

'তাহলে চলুন, কোনো পলিক্লিনিকে যাই না হয়।' আমি শুধাই, পলিক্লিনিক জানেন তো?'

'পলিকে জানব না? বলেন কি! এক গাল হাসি দেখি তাঁর, 'আপনার নাতিকে আর জানিনে আমি? কতবার আমার কাছে এসেছে সে। খাসা ছেলে পলি।'

'আহা, সে পলি নয়। সেই পলি ছাড়া কি আর অন্য পলি আপনি জানেন না?' আমি বলি।

'জানবো না কেন? মনোপলি জানি। আমাদের যেমন ঐ কাঠের কারবারের মনোপলি। একচেটে ব্যবসা যাকে বলে। একেবারে আকাঠ মশাই বুঝলেন?

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাই হোক পলিক্লিনিক হল যেখানে কিনা এক জায়গায় সব রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে থাকে সর্ব

রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রয়েছেন যেখানে।'

'চলুন তবে সেখানেই।'

আমরা বেরিয়ে পড়লাম তৎক্ষণাৎ।

নামজাদা এক পলিক্লিনিকে যাওয়া হোলো। সেখানে এক জায়গাতেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মস্তক এবং দন্ত থেকে অনন্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা।

যে কামরাটায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হোলো, সেখানে গুরু-গম্ভীর এক ডাক্তার ব্যক্তি বসে। গোড়াতেই তিনি কড়কড়ে বত্রিশটি টাকা তাঁর ফী বাজিয়ে নিলেন। তারপর হর্ষবর্ধনকে বাজাতে বসলেন।

হাতের টাকার মতন হাতের টোকায় বাজাতে লাগলেন তাঁর বুক পিঠ। টেম্‌পারেচার নেওয়া হল তাঁর। থার্মোমিটারের পর ষ্টেথিস্-কোপ দিয়ে দেখা হোলো। তাঁর কথায় চোখ উলটে জিভ পালটে দেখাতে হোলো। এমনকি আলজিভটাও না দেখে তিনি ছাড়লেন না।

আপাদমস্তক সমস্ত দেখে শুনে রিপোর্টের খাতায় টুকে নিয়ে তিনি বললেন, 'ট্রাবলটা কি আপনার?'

'ট্রাবল এই হাতে।' হর্ষবর্ধন হাতটা দেখালেন।

ডাক্তার নাড়ি দেখার চেষ্টা করতেই তিনি বাধা দিয়ে বললেন, নাড়ির ভেতর কিছু হয়নি। নাড়িভুঁড়িতে কোনো গলদ নেই আমার। ভুঁড়িটা আমার একটু মোটা—এমনিতেই। 'শুধু এই হাতটা কেমন যেন ব্যাথাচ্ছে আমার সকাল থেকে।'

'হাত ব্যাথা করছে? দেখি আপনার দাঁত দেখি।'

দাঁতের ওপর চোখ কেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। জিজ্ঞেস করি, 'হাতের সঙ্গে দাঁতের কি সম্পর্ক?'

'দাঁত খারাপ থাকলে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। সেই এক দোষ থেকেই হরেক উপসর্গ দেখা দেয়।'

'চোখও পরীক্ষা করতে হবে নাকি ওঁকে আবার?' আমি শুধাই।

'হতেও পারে। আগে রক্তটা দিন আপনার।' বলে রক্ত নেবার সিরিঞ্জটা বার করেন ডাক্তার।

'অ্যাঁ? রক্ত? রক্তও দিতে হবে?' আঁতকে উঠেন হর্ষবর্ধন, 'রক্তপাতও করতে হবে আবার?'

'কোনো ভয় নেই। একটুও লাগবে না আপনার। টুক করে তুলে নেব দেখবেন। টেরও পাবেন না আপনি।' ভরসা দেন ডাক্তারবাবু।

আপাদমস্তক সর্বাঙ্গের সবরকম পরীক্ষা করালেন হর্ষবর্ধন, বুক পেট পিঠ হাত পা দাঁত—কোনটার বাদ গেল না তাঁর। এমনকি, তাঁর ব্লাডপ্রেসারও টের পাওয়া হোলো তারপর। তাঁর ওজন এবং বিশেষ বিবরণও নিলেন ডাক্তাররা।

সব কিছু দেখিয়ে শুনিয়ে, দেখে শুনে শ পাঁচেকের মত খসিয়ে হর্ষবর্ধন নিজের হাত ধরে বাড়ি ফিরলেন—যেমন গেছলেন ঠিক তেমনি কাতরাতে কাতরাতে।

কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থাই হোলো না সেদিন। বড় ডাক্তারের সঙ্গে—যিনি সবার ওপরওয়ালা সবসেরা অলরাউণ্ড ফিজিসিয়ান—সঙ্গে মুলাকাতও হোলো না এমন কি!

রাস্তায় দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা। আমাদের কথা শুনে একজন বললে আর্নিকা খেতে, ত্রিশ থেকে তিনশো শক্তি অবধি যা খুশি। আরেকজন বললে চুন হলুদ গরম করে লাগাতে।

তৃতীয় এক ব্যক্তি, পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন, পথের মধ্যে উপচে-পড়া আমাদের কথা শুনে ওপর চড়াও হয়ে বলে গেলেন, 'আর কিছু নয়, আশ্চর্য মলম। আশ্চর্য জিনিস মশাই! লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই আরাম।'

এই মতদ্বৈধ নাকি মতত্রৈধের মধ্যে কোন্ ব্যবস্থাটা যে বৈধ কি করে তার আঁচ পাবো না আঁচানো থাকলে?

আমি বললাম, খুব বড়ো ডাক্তার দেখাচ্ছেন উনি। বিধিসম্মত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পক্ষপাতী। 'ওসব টোটকা-টুটকির কম্মো না ভাই।'

'তাহলে শুধু ডাক্তারেই শানাবে না বন্ধু! শেষ পর্যন্ত সার্জনের কাছেই যেতে হবে।' একজন জানালে, 'বলেছিলাম ভালো কথা, এক ডোজ আর্নিকাতেই সেরে যেতো একদিনে, ভুগতে হোতো না রোজ রোজ। শুনলে না! অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারের খপ্পরে পড়ছো যখন, তখন আর দেখতে হবে না!' রেহাই পাচ্ছ না সহজে খপ্ করে। তোমার ঐ হাত আওড়াবে, পাকবে, ফুলবে, ফুলে ঢোল হবে। তারপর পচতে শুরু করবে। পচন ধরবার পর সার্জন এসে তোমার হাজার টাকা খশিয়ে নেবার পর কেটে বাদ দিতে হবে হাত। অপারেশন অবশ্যি বেশ সাকসেসফুলই হবে, তা বলাই বাহুল্য! তবে তোমাকে পটল তুলতে হবে ঐ অপারেশনের টেবিলেই!'

ঐ কথা শুনেই হর্ষবর্ধনের হাতের যন্ত্রণা বেড়ে গেল সাত গুণ। অমন ব্যাথাতেও একটুখানি গুমরাতেও ভুলে গেলেন তিনি। কেমন গুম হয়ে গেলেন।

'আমার পক্ষাঘাত হয়েছে।' বাড়ি ফিরে কেবল এই কথা বলেই বিছানায় তিনি কাত হয়ে পড়লেন। আজ কোনো উচ্চবাচ্য নেই তাঁর।

পরদিন সকালে আমরা পলিক্লিনিকে গিয়ে হাজির হলাম। দেখি, রিপোর্ট-টিপোর্ট রেডি। সব রকমের রিপোর্ট। ব্লাড, ইউরিন ইত্যাদি যাবতীয় পরীক্ষার ফলাফল এসে গেছে। মায় এক্স-রে ফটোর কপিও।

অতঃপর সবার বড় সেই ডাক্তারসাহেবের কাছে যেতে হলো। গিয়ে সবার আগে তাঁর টেবিলের ওপর ফীয়ের একশ কুড়ি টাকা জমা রেখে জিজ্ঞাসুভাবে আমরা তটস্থ হলাম।

'দেখলাম সব।' বললেন ডাক্তারসাহেব, 'কিছুই হয়নি আপনার। খানিকক্ষণ গরম জলে হাত ডুবিয়ে রাখুন গে কব্জি অব্দি, তাহলেই সেরে যাবে মনে হয়।'

'ব্যাথা না হয় সারলো। কিন্তু ফোস্কা?' হর্ষবর্ধন ওস্‌কান।

'কিসের ফোস্কা?' ফোঁস করে ওঠেন ডাক্তার-সাহেব। তাঁকে

একটু অবাক দেখা যায় যেন।

'গরম জলে হাত ডোবালে পুড়ে যাবে না?' ফাঁস করেন হর্ষবর্ধন হাঁসফাঁস করতে করতে।

'আহা অসহনীয় গরম। অসহনীয় বলেছি কি?'

বাসায় ফিরে এসে এক বালতী সহনীয় গরম জল হাত ডুবতেই সারা হাত ঝনঝন করে উঠল তাঁর। ব্যাথা বেড়ে গেল বিশগুণ। আর্তনাদ ছাড়তে লাগলেন তিনি।

বাসার ঝি বলল এসে, 'ঠাণ্ডা জল ঢালুন বাবু, এক্ষুণি আপনার বেদনা ছেড়ে যাবে চট করে।'

ঠাণ্ডা জল ঢালতেই, কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে গেল ব্যাথাটা। কোথায় যে পালালো তার কোন পাত্তাই রইল না।

সেই হাতেই টেলিফোন তুলে জানালেন তিনি ডাক্তারকে, 'মশাই, আপনি যে বললেন গরম জলে হাত ডুবুতে, তাই না করে আমার ব্যাথা আরো ঢের বেড়ে গেল তক্ষুণি। তারপর আমাদের বাসার ঝিয়ের কথায় ঠাণ্ডা জল ঢালতেই সেটা কমে গেছে।'

'যাক্, ঠাণ্ডা হয়েছে তো? তাহলেই হোলো।'

'কিন্তু মশাই,' সহজে ছাড়েন না হর্ষবর্ধন, 'আমি যে আপনাকে অতগুলো টাকা গুণে দিলাম সে কি এইজন্যে? যদি আমাদের ঝিয়ের টোটকাতেই আরাম হবে তাহলে—'

'সেই কথাই আমিও ভাবছি।' ভাবিত কণ্ঠের জবাব শোনা গেল ডাক্তারের, 'আমার চারকটা কিন্তু বলেছিল গরম জলের কথাই।'

হর্ষবর্ধনের তাজ্জব

হর্ষবর্ধনের শ্রমদানের এক কাহিনী। শ্রমদান না বলেই শ্রমের জন্য দান বলাটাই ঠিক।

বিনা স্বার্থে বা পারিশ্রমিকে পরের কর্মে নিজের ঘর্মদানকেই শ্রমদান বলে থাকে বোধ হয়? ভূদান মার্কা দান খয়রাৎ, এটা একেবারেই কোনো ভুয়ো ব্যাপার নয়—ভূয়োদর্শী মাত্রই জানেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিক উলটোটাই ঘটেছিল। পরের শ্রমের জন্য বা পরিশ্রমের হেতু হর্ষবর্ধন দান করেছিলেন। সেই দানটা আবার নানান অনেকের বিনাশ্রমে অল্পবিস্তর প্রাপ্তিযোগের কারণ হয়েছিল, বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে যোগাযোগের সেই অকিঞ্চিৎকর বৃত্তান্ত এই···

কী করে ঘটলো বলি···

চেতলার কারখানায় গিয়ে দেখি হর্ষবর্ধন এক কাণ্ড করে বসেছেন। নিজের গালে হাত দিয়ে বসে আছেন।

দৃশ্যটা বিস্ময়কর, কেননা হর্ষবর্ধন-বিরুদ্ধে এহেন স্বকপোল কল্পনা আমি ধারণাও করতে পারিনা। নিজের গাল হস্তগত করতে কখনও আমি তাঁকে দেখিনি, অবশ্যি পরহস্তগত হতেও দেখিনি যদিও, তাহলেও নিজের গালে হস্তক্ষেপ করতে কাউকে কখনও দেখা যায় কি?

ছোট ছোট ছেলে মেয়ের গালে আদরের ছলে বড়দের স্থূল হস্তাবলেপ হতে দেখা যায় সময় সময়, আবার চপেটাঘাতের তালে পরের গালে চড়-চাপড়ের পালা পড়তেও দেখা গেছে, কিন্তু আত্মচর্চায় নিজের গাল হাতাতে কাউকে আমি দেখিনি কখনো।

'গালে হাত দিয়ে এত কী ভাবছেন মশাই?' আমি শুধালাম।

'গালে নয়, আমার কপালে হাত পড়েছে।...ভাবনায় পড়েছি। ভারী।' বলে তেমনি ভারিক্কি এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'পেটে না হাত পড়ে শেষটায়।'

'তার মানে?'

'আমার এই কারখানায় বানানো যত আসবার পত্র দেখছেন না? এইসব হাল ফ্যাশানের আনকোরা ডিজাইনের নিত্যনতুন কায়দায় দেখছেন যত না—এসব আর চলছে না আজকাল। লোকের রুচি পালটাচ্ছে।'

'সে কি! আপনার এইসব চমৎকার তক্তপোষে শুয়ে আরাম পাচ্ছে না কেউ? ঘুম হচ্ছে না তাদের?'

'কোথায় হচ্ছে আর।' আবার তাঁর নাসারন্ধ্রের পথে আরেক ফুৎকার!

'বলেন কি মশাই! এমন চমৎকার কারুকার্যকরা তক্তপোষে শুয়েও ঘুম হচ্ছে না কারো!' শুনেই আমি হতবাক: 'আমার তো মশাই, যেকোনো তক্তপোষ পেলেই ঘুম এসে যায়, অবশ্যি যদি তার ওপর গদির আপোস থাকে আর পেটের ভিতর উপোস না থাকে!'

'দূর মশাই! আপনার খালি খাই খাই আর শুই! খাওয়া আর শোওয়ার ধান্দাতেই রয়েছেন কেবল। তুনিয়ার সবাই আপনার মতন নয়। তাদের মন আছে। মন বলে একটা পদার্থ আছে তাদের।'

'তা, কি হয়েছে তাদের?'

'মন থাকলেই রুচি থাকে। মন বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে রুচি পালটে যায়। ফ্যাশানের মোড় ঘোড়ে। জানেন এসব? খবর রাখে এর?'

'আজ্ঞে না।'

'এখনকার লোক আর একেলে জিনিস নিয়ে খুশী হচ্ছে না সেকেলে জিনিস চাইছে। একালের ফ্যাশানে আর মন উঠছে না তাদের, সেকালের ফ্যাশানে ফিরে যেতে চাইছে। অলঙ্কারের রাজ্যে দেখছেন না কি? আমার বৌ কী সব গয়না বাজারে ঢুঁড়ে কিনে এনেছেন? সবার শেষ তাই। সেকালের হুঁসুলি বাউটি বাজুবন্দ

আবার তাঁদের এখন নয়া পছন্দ !! বলছি কি তবে ? মাথার সিঁথিময়ুর থেকে পায়ের চপ্‌পল পর্যন্ত আপাদমস্তক পরিবর্তন।'

'তাই নাকি ?'

'তবে আর বলছি কী ? সেইমত এখন বাসন-কোশন, বসন-ভূষণ, আসন-আসবাব প্রভৃতি সবকিছুতেই সেকালকে ফিরিয়ে আনতে হবে, নইলে আর একালের লোকের মন উঠবে না। বুঝেছেন মশাই ?

'আপনার এমন সব ফার্নিচারে আরাম পাচ্ছে না তারা ? এই আরামের রাজত্ব ফেলে...'

'রামরাজত্বের আমলে ফিরে যেতে চাইছে তারা। সেই রকম খাট পালঙ্ক সব বানাতে হবে আমাদের এখন। তাই ভাবছিলাম...'

'ভাবনার কথাই বটে।' আমি মাথা নাড়ি।

'আচ্ছা, রামকে বনে পাঠাবার জন্যে রাজা দশরথের সঙ্গে ঝগড়া করে ছুয়োরানী কৈকেয়ী যে পালঙ্ক ফেলে ভূঁয়ের ওপর শুয়েছিলেন সেই পালঙ্কের নক্সাটা ছিল কেমন বলতে পারেন ?'

'না। তবে ভূঁয়ের নক্সাটা বাতলাতে পারি। এখানকার মত এই রকমই মাটি হবে।' আমি ভূয়োদর্শীর মতই কই।

'সেই পালঙ্কটার নক্সা আমি চাই। পেলে পরে বাজারে চালাই এখন।' তিনি সোৎসাহে কন ঃ 'বাজার মাৎ করে দিই তাহলে।'

'কোথায় পাব সে নক্সা ?'

'রামায়ণ মহাভারতের কোথাও ? কোনো পুরাণে-ফুরাণে ? নেই কোনো খানে ?'

'খট্টাঙ্গ-পুরাণ বলে কোনো পুঁথি আছে কি না জানি না। থাকলে তাতেই থাকা সম্ভব। নয় তো অজন্তায়। সেইখানেই যেতে হবে আপনাকে।'

'আপনার মতন এমন সবজান্তা থাকতে আমি অজান্তার কাছে কাছে যাব কেন ? সে কী জানে! সে কী জানাবে আমাকে!'

আহা, সে অজান্তা লোক কেন হবে গো! অজন্তা শোনেননি ? অজন্তা গুহা। সেখানকার গিরিগাত্রে গুহার গর্ভে সেকালের ছবি-

টবি খোদাই করা আঁকা হয়ে রয়েছে, তাই থেকে আপনার মনের মতন আসবাব পত্রের নক্সাও আপনি পেতে পারবেন। অজন্তা, ইলোরা, মহেঞ্জোদোরো, হরপ পায় পাবেন এসব।'

'কেন, এই কলকাতায় বসে পাওয়া যায় না?'

'পেতে পারেন হয়ত। তাহলে আপনাকে যেতে হবে আমাদের জাতীয় পাঠাগারে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে! সেখানে যদি ঐ সব জায়গায় নক্শা টক্সার প্রতিলিপি থেকে থাকে কিম্বা ও সবের বর্ণনা দেওয়া কোনো পুরানো বইপত্র। থাকলে ওখানেই থাকবে। পাওয়া যাবে ঐখানেই।'

'তা হলে ওখানেই যাওয়া যাক। জায়গাটা কোথায়?'

'আপনার এই চেতলার বাড়ির থেকে বেশিদূর না। যে তেত্রিশের বাস ধরে আপনার এখানে এলাম, সেই পথের ওপরেই পড়ে জায়গাটা।...

'বটে? বটে? চলুন চলুন! শুভস্য শীঘ্রম্।' বলতে বলতে তিনি উঠে পড়েছেন।

তারপর ট্যাক্সি চেপে চকিতের মধ্যে আমরা তাঁর চেতলার কারখানার থেকে সেই লাইব্রেরী কাণ্ডে গিয়ে পড়েছি। কাঠের রাজ্য থেকে যতো আকাঠের রাজ্যে।

সেখানে গিয়ে, সৌভাগ্যই যে, সঙ্গে সঙ্গে আমার এক গবেষক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লাম—কথার সঙ্গে হর্ষবর্ধনকেও—'ইনি আমার এক বন্ধু, কাঠের কারবারী। আমাদের জাতীয় আসবাবপত্রের পুরাতত্ত্ব জানতে উদ্গ্রীব।'

'আসবাবপত্রের পুরাতত্ত্ব? কিন্তু তার সম্পূর্ণ খবর কে রাখে?'

'পুরাতত্ত্ব মানে পুরাবৃত্ত? ফ্যাশনচক্র তো একই বৃত্তে ঘোরে ফেরে বারবার দেখা গেছে নাকি। সেকালের পোষাক আষাক যেমন একালে ফিরে আসছে—সেই বাবরি চুল, সেই জুলপি দেওয়া গালপাট্টা —দ্যাখোনি?...'

'এমনকি গয়না টয়নার ব্যাপারেও সে যুগের মামুলি অলঙ্কার সব

ফ্যাশন হচ্ছে এখন। সেই হাঁসুলি, বিছে, তাগা, অনন্ত, বাউটি, বাজু ইত্যাদি ইত্যাদি যেমনটা ফিরে আসছে না ফের। হর্ষবর্ধন কন।

'বৃত্তটা সম্পূর্ণ ঘুরে এসেছে এতাবৎ। আসবাবপত্রের বেলাতেও সেই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে—বৃত্ত পুরা হয়েছে। সেই পুরাবৃত্ত· তার বৃত্তান্তেরই খোঁজখবর চান ইনি। কোথাকার—কোন্ বইয়ে তা পেতে পারেন জানতে চান তাই।'

'আসবাবপত্রের ফ্যাসনে আমি আবার রামরাজ্যের আমদানি করতে চাই মশাই!'

'ও এই!' শুনেই তিনি লাইব্রেরিয়ানের কাছে নিয়ে গেলেন। প্রয়োজনীয় পুঁথিপত্তরের হদিশ বাতলে দিলেন। তারপরে সে সব হাতে এলে, কোথায় যে মেলে দেখিয়ে দিলেন তাও—'এই পাতা কটাতেই জানবার যা কিছু পেয়ে যাবেন।'

পাতা কটার ওপর চোখ বুলিয়ে সায় দিলেন হর্ষবর্ধন—হ্যাঁ, এই হলেই হবে। আপাতত এই যথেষ্ট। তা, কত টাকা দিতে হবে বইটার জন্য আপনাদের? 'দুশো? পাঁচশো? দু'হাজার?' লাইব্রেরিয়ানকে তিনি শুধান।

'বই তো আমরা বেচব না। এমন কি দশ হাজার টাকা জমা রেখেও ছাড়তে পারব না এসব বই। রেয়ার বুক্স-পর্যায়ের কিনা এসব। তবে এখানে এসে পড়তে পারেন—কপি করে নিয়ে যেতে পারেন ইচ্ছে করলে। এই কটা পাতাই তো? কেউ বসে কপি কপি করলে ঘণ্টাখানেকের মামলা। কিন্তু দোহাই, শর্টকাটে যাবেন না যেন। খবরদার।'

শর্টকাটের মানে বুঝতে চান হর্ষবর্ধন।

'মানে, ব্লেড দিয়ে পাতা কটা কচ করে কেটে নেবার কু-মতলব ভাঁজবেন না। তা হলেই থানায় যেতে হবে বুঝেছেন?'

'সেখান থেকে সোজা শ্রীঘর। সেটা আবার এই আলিপুরেই।' আমি খোলসা করে বুঝিয়ে দিই—'কুচ কাম নেহি, এইসা কামকা বাস্তে এহি হোতা হ্যায়!' রাষ্ট্রভাষায় বক্তব্যটা রাষ্ট্র করি তার ওপর।

রাষ্ট্র করার পর আমার রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রকাশ পায় সারা বাংলায় সত্যি বলতে এই সব কিছু করতে আমরা উৎসাহ পাই না—যাঁদের নাম বহনের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁদের একজন অবশ্যি সেই ত্রেতা যুগে কপিদের নিয়ে কিছু কাজ করেছিলেন কিন্তু একালে আজ আমার পক্ষে এই কপিকল হওয়ার সাধ্য একেবারে নেই।'

'মানুষের অসাধ্য কিছু আছে নাকি মশাই?' তিনি আমায় উদ্দীপনা দিতে চান—'বেশ আপনার একটা গল্পলেখার পারিশ্রমিক যদি আপনাকে দিই? আপনার একটা লেখার দাম কতো? এক ঘণ্টায় আপনি কত রোজগার করেন বলুন তা হলে?'

তাহলে? আমি ভাবতে লাগি। ভেবে দেখি সে কথা কহতব্য নয়। ঘণ্টাখানেক রিক্সা টানলে যতো রোজগার হয় কলম টেনে আমার উপায় তার চেয়ে ঢের ঢের কম। আমার পাড়ার একটা ঠেলাওয়ালা এক বেলা ঠেলা ঠেলে যা কামাই করে একাধিক সম্পাদককে ঠেলাঠেলি করেও তার সিকির সিকি আমি দেখতে পাই না।

আমাকে ভাবান্বিত দেখে হর্ষ কন 'আপনার ঘণ্টা মজুরীর হিসেব থাক। আপনাকে অত মাথা ঘামাতে হবে না। তার চেয়ে আমার হিসেবেই আপনাকে দিই না হয়। এক ঘণ্টায় আমার নিজের যা আয় হয় তাই থেকেই হিসেবটা বার করা যাক। মিনিটে মিনিটে কত হয় তার চুলচেরা খতিয়ানে না গিয়ে ঘণ্টায় মোটামুটি হাজার খানেক—সব না বেচা কেনার দিনেও হয়ে থাকে, আমার ধারণা। সেই হারেই দিই না কেন আপনাকে? এই টুকু কপি কপি করার জন্য হাজার খানেক সব বেশী নয় বিবেচনা করে দেখলে। তবে সাধারণ জ্ঞানে এক ঘণ্টার পারিশ্রমিক এক হাজারই ঠিক, তার কম নেওয়া যায় না, দেওয়াও যায় না কাউকে।' বিবেচনা পূর্বক তিনি কন—'কেমন. ভেবে দেখুন আপনি রাজী কিনা।'

না ভেবে চিন্তেও নারাজ হওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বলি—'হ্যাঁ, রাজী। তবে ঘণ্টাখানেকের ভেতর আমার দ্বারা

হয়ে উঠবে না। সময় লাগবে। রয়ে বসে ধীরে সুস্থে এই কটা পাতা কব্জা করতে কয়েক ঘণ্টা লাগবে আমার। বিকেল গড়িয়ে যাবে বোধ হচ্ছে। তবে সময় যাই লাগুক, আপনাকে ওর বেশী টাকা লাগাতে হবে না আর। ওই এক হাজারই আমার যথেষ্ট।'

'তা যত ঘণ্টা লাগে লাগুক। আমি আমার কারখানায় গেলুম। সন্ধ্যে বেলায় এসে নেব খন। এই ধরুন আপনার দক্ষিণার এক হাজার।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি হাত বাড়াই। হাজারে ব্যাজার আমি কক্ষণো নই। উনি পকেটের থেকে খান দশেক বড় নোট বার করে দিয়ে গেলেন।

আর তিনি উধাও হবার পরই আমি সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগলুম। সেই গবেষক বন্ধুটিকে গিয়ে ধরলুম—'ভাই, এই পাতা কটা তুমি কপি কপি করে দেবে আমায়? তার জন্য পাঁচশো টাকা দেব আমি।' তারপরে তাঁর মৌনতার সুযোগ নিয়ে পাঁচশো টাকা তাঁর হাতে ধরে দিই।

তিনিও মুখ বুজে নিয়ে নেন। কোনো উচ্চ বাচ্য না করেই।

আর, তার পরেই আমার চোখের ওপরেই সেখানে পাঠরত তাঁর কলেজের এক ছাত্রকে ডেকে বলেন—'বাপু, এই পাতা কটা কপি করে দাও তো চটপট। ধরো এই দুশো টাকা।'

আমি পাঁচশো আর তিনি, তিনি তিনশ নগদ পকেটস্থ করে বেরুবার মুখেই দেখতে পেলাম তিনি শিশু বিভাগের পড়ুয়া বাল-খিল্যদের একজনকে পাকড়ে এনেছে আর তার হাতে একশ টাকার নোট একখানা গছিয়ে দিয়ে কী যেন বলছে…।

কী বলছে তা বুঝতে আমাদের বিলম্ব হল না।

সন্ধ্যের মুখে এলেন হর্ষবর্ধন। এসেই তাঁর কপিটা পেলেন। লাইব্রেরির এক বেয়ারার হাত থেকে। সে তাই নিয়ে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

তাই পেয়েই হর্ষবর্ধন কী হর্ষোৎফুল্ল!

—'বাঃ, বেশ হয়েছে। দিব্যি কপি। গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দেওয়া—হস্তলিপি শেখার বইয়ে যেমনটা থাকে। স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। পড়ে বোঝার কোনো অসুবিধা হবে না আমার।'

হ্যাঁ বাবু! আপ্যায়িত হসি হাসে বেয়ারা।

বেচারার হাসিটা একটু বেয়াড়া ঠেকলেও হর্ষবর্ধন কিছু কম আপ্যায়িত নন—এতক্ষণ তুমি এই নিয়ে কষ্ট করে দাঁড়িয়েছিলে আমার জন্মে? তোমাকেও কিছু দিই, কেমন? টিফিন করোগে?

তার মানিব্যগ উন্মুখ করার আগে বেয়ারাটা ব্যগ্রভাবে বাধা দেয় —আবার কেন দিবেন বাবু? আমার মেহনতি তো পেয়েই গেছি। এই টুকুন লিখার কাম, এর জন্য দশ টাকাই তো বহুত। দশ টাকা মজুরি! বহুৎ বহুৎ! আর আমার চাইনা বাবু।'

উন্মুক্ত ব্যাগের উন্মুখ একশ টাকা হাতে ধরে হর্ষবর্ধন হতভম্ব হন! টাকা দিতে গিয়ে এই প্রথম তাঁকে অপরাগ হতে হয়। অর্থনির্লোভ এ রকম বোকা লোক আছে নাকি কোথাও!

হাঁদারামের দাদা

'ছেলে তো নয়, কিচ্ছু', বলছিলেন নীলকৃষ্ণবাবু ঃ 'ওকে পুঁতলে গাছ হয়'

'কী গাছ ?' আমার সকৌতুক প্রশ্ন।

'বিছুটি গাছ।' উনি মুখ বিকৃত করে বললেন ঃ 'বিছুটির ঘা মারলেও ও-ছেলের কিচ্ছু হবে না।'

'ওর আঘাতেই কি আপনি অমন ভালো টিউশানিটা ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন ?' আমি বলতে যাই।

'মোটা টাকার টিউশানির লোভে গিয়েছিলাম মশাই!' নীলকৃষ্ণ বাবু সবিশেষ বিবৃত করেন ঃ 'ওর বাবার শর্ত ছিল যে আমি ওঁর ছেলের গায়ে হাতটি তুলতে পারব না। আর, ওর যত বায়না, আবদার সব কিছু অম্লান বদনে সইতে হবে আমায়। রোজ এক ঘণ্টার মামলা, মাসকাবারে নগদ নিরানব্বই টাকা। রাজী হয়ে গেলাম তাই।'

'তারপর ?'

'প্রথম দিন ছেলেটি বলল, 'স্যার আপনাকে একটা গাঁট্টা মারব ?' আমি আপত্তি করায় বলল, তাহলে আমি পড়বই না। টাকার অঙ্কটা বিবেচনা করে বললাম, 'বেশ, একটু আস্তে মেরো তাহলে। পরের দিন বলে, 'আপনি চীৎকার করে নামতা পড়ুন আমি বসে বসে শুনি।'

'আপনি কী করলেন ?'

'প্রথমটা একটু আমতা আমতা করলাম। কিন্তু ঐ নিরানব্বইয়ের কথাটা মনে পড়ে গেল। পড়তে লাগলাম নামতা—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। তারপরের দিন ছেলেটা বলে কিনা...' বলতে গিয়ে নীলকৃষ্ণবাবু রাগে লালকৃষ্ণ হয়ে ওঠেন।

'কী বলে ছেলেটা ?' আমি শুধাই।

'বলে যে ঐ রোদ্দুরে আপনি ঘণ্টাখানেক এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি বসে বসে দেখি। শুনেই না··· আমি তার মাথায় আমার প্রথম দিনের গাঁট্টাটা শোধ করে দয়ে উর্ধ্বশ্বাসে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সেই যে পালিয়েছি যাইনি আর।'

'তা, ঐ টিউশানিটা আমায় করে দিন মশাই!' আমি সাধলাম। 'আমি রাজী আছি ওকে পড়াতে। কিংবা, ওর কাছে পড়তে—যাই বলুন!'

'আপনি করবেন ওই টিউশানি?'

'কী করব? লিখে-টিখে কিছু হয় না আমার। একেবারে কিছু হয় না, বলা হয়ত ঠিক নয়। হাঁটাহাঁটি মন্দ হয় না। কাগজের আপিসে আপিসে ঘুরে ঘুরে হয়রানিও বেশ হয়—কিন্তু টাকাপয়সা হয় না। কিন্তু আপনি বলছেন এখানে মাসকাবারে নগদ একশ করে—'

'একশ নয়, নিরানব্বই।' তিনি মনে করিয়ে দেন—'আর, ঐ নিরানব্বইয়ের ধাক্কা নেহাৎ সোজা ধাক্কা নয় মশাই!'

'তাহোক, এক কম একশই হোল না হয়। আমি রাজী।'

'তা হলে চলে যান সোজা।' তিনি ঠিকানাটা বাতলে দেন আমাকেঃ 'কারুকে কিছু বলতে কইতে হবে না, কারো কোনো রেকমেণ্ডেশনের দরকার নেই, গেলেই লুফে নেবে ছেলের বাবা। হাজার চেষ্টা করেও—মাস্টার পান না তিনি ছেলের, পেলেও বেশিদিন টেঁকে না সে।'

'এক কম একশ টাকার টেকসো দিয়েও টেকসই হয় না মাস্টার?'—আশ্চর্য লাগে আমার। নিজের মাথায় ঘা কতক গাঁট্টা মেরে দেখলাম, নামতার ঘরগুলো মুখস্থ করে রাখলাম ভালো করে—তারপর রোদে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রিহার্সাল দিয়ে নিলাম একবার—তারপরে পা বাড়ালাম সেই বাড়ির দিকে।

অকুস্থলে পৌঁছতেই ভদ্রলোক লুফে নিলেন সত্যিই! বললেন,

'ভালই হোলো, ছেলের আমার বার্ষিক পরীক্ষা সামনে, আর কটা দিন বাদেই বলতে গেলে ; তা শুনুন, আমার কিন্তু কয়েকটা শর্ত আছে মশাই'···বলে নীলকৃষ্ণবাবু-প্রমুখাৎ আমার জানা সেই কথগুলোই শোনালেন আবার আমায়'···এর জন্য আপনি মাস মাস মোট নিরানব্বই টাকা পাবেন আমার কাছে···।'

'নিরানব্বই কেন ? পুরো একশ নয় কেন ?' আমি জিজ্ঞেস করি। 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কায় আমায় ফেলছেন কেন আবার ?'

'দেখুন ঐ শূন্যর মধ্যে আমি নেই। একের পিঠে ডবোল শূন্য দিয়ে মাস্টার রাখলে ছেলের পরীক্ষার খাতাতেও ঐ শূন্য উঠবে তাহলে। আর তাহলে বুঝতেই পারছেন, আপনার মাইনের বেলাতেও ঐ শূন্যই !'

'বেশ তাহলে ঐ নিরানব্ব-ই সই। কিন্তু ঐ সঙ্গে আমাকে ডিয়ার নেস অ্যালাউন্স দিতে হবে টেন পারসেন্ট—যেটা দস্তুর।'

'দস্তুর ? সে তো চাকরদের বেলাতেই হয় মশাই। মাস্টারি করাটা কি একটা চাকরি নাকি ?'

'চাকরদের বেলায় ওটা হচ্ছে মাগ্যি ভাতা। ডিয়ার কথাটার একটা মানে হচ্ছে মহার্ঘ, সেই অর্থে। কিন্তু ডিয়ারের আরেকটা মানেও তো আছে মশাই, যার অর্থ হচ্ছে প্রিয়।'

'প্রিয় তো কী হয়েছে ?' তিনি একটু অবাক হন যেন।

'আপনার ছেলের প্রতি আমার একটু প্রিয় প্রিয় ভাব দেখাতে হবে ত ? সেই ডিয়ারনেস দেখানোর জন্যেই এই বাড়তি টাকাটা। আপনি আমাকে নিরানব্বই প্লাস ন টাকা নব্বই পয়সা—আচ্ছা, শূন্যটা বাদ দিন না হয়, ঐ একশ আট টাকা একানব্বই পয়সাই দেবেন মোটমাট !'

তিনি রাজী হলেন শেষ পর্যন্ত। 'এক পয়সা বেশি চলে যাচ্ছে, তা যাক—' তিনি বললেন, 'বেশ, দেব একশ আট টাকা একানব্বই পয়সা কিন্তু কথাটা আমার মনে আছে তো ? ছেলেকে আদর করে পড়াতে হবে। ছেলের গায়ে হাত তুলতে পারবেন না মশাই !'

'পাগল হয়েছেন! কদাচ না। পরের ছেলের গায়ে কেউ হাত দেয় কখনো? নিজের ছেলেকে আপনি যা ইচ্ছে করুন, ল্যাজের দিকে কাটুন, যত খুশী ঠেঙান ধরে, কিন্তু পরের ছেলে? বাপ্! এক দম অস্পৃশ্য।

বিশেষ করে ঐ পেহ্লাদ-মার্কা ছেলেরা, মনে মনেই আওড়াই আমি শ্রীহরির সাক্ষাৎ আপনজন। একেবারে হরিজন আমার কাছে। তাদের ছায়া মাড়াতে নেই পারৎ পক্ষে। নেহাত টাকার মায়াতেই না আমায় ···

পরের দিন ছেলে পড়াতে গিয়ে গোড়াতেই একখানা বড় চকোলেট বার করলাম। চকোলেটের বার তার হাতে দিয়ে বললাম— খাও।

আমার মাথায় গাঁট্টা মারবার জন্য ছেলেটা ঘুসি পাকিয়ে তৈরী হয়েই বসেছিল দেখলাম, কিন্তু চকোলেটখানা পেয়ে হাতের মুঠো আলগা হোলো তার।

গালে হাত দিয়ে বলল—'আপনি ভারী ভালো মাস্টারমশাই!'

'রোজ তোমার জন্যে এমনি একখানা করে চকোলোট আনব। মন দিয়ে পড়বে ত তুমি?'

'নিশ্চয় নিশ্চয় স্যার!' দারুণ উৎসাহ দেখায় সে।

'চকোলেট আর পড়া এক সঙ্গে মুখস্থ করবে, কেমন?' আমি বললাম: 'চকোলেট দিয়ে পড়া আর পড়া দিয়ে চকোলেট মুখস্থ করানোই হচ্ছে আমার পড়ানোর নিয়ম।'

'আপনার মতন ভালো স্যার আর একজনও আসে নি। আপনি খুউব ভালো।'

ছেলেটির সার্টিফিকেটে আমি পুলকিত হয়ে ভাবলাম, মাথাটা আমার বেঁচে গেল এ যাত্রা। এই দুর্বল মস্তিষ্কে ঐ ষণ্ডামার্কা ছেলের গাঁট্টা সইতে হলেই মাথার ভেতরের যতো গোবর চলকে যেত আমার। ঘুঁটে হবার আর ফুরসৎ পেত না, পটল তুলতে হত একেবারে।

আর, ভেবে দেখলে, গাঁট্টা বাঁচাতে আমার গাঁট থেকেও তো

যাচ্ছে না তেমন কিছু। ঐ ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের নটাকা ৯০ পয়সার থেকেই আমার চকোলেট কেনা। যার দরুন কষ্ট করে আমাকে আর ভাবালু হতে হবে না, ছেলেটাই দারুণ প্রিয় প্রিয় ভাব দেখাবে এখন আমায়।

'তোমার নাম কি ?' তারপরে আমি শুধালাম।

'হাঁদারাম।' সে জানালো। 'আপনার নামটা কী স্যার ?'

নাম বললাম আমি। আরো বললাম—'দেখছ ত! রামে রামে কেমন মিল আমাদের।' নামে নামে মিলটা দেখিয়ে আমাদের প্রিয় প্রিয় ভাবটা আরও একটু জমাবার চেষ্টা করা গেল।

'আপনার নামটা ভোঁদারাম থাক না স্যার আজ থেকে ?' মুক্ত-কণ্ঠে বলল সে : 'তাহলে আমাদের নামের মিলটা বাড়বে আরো। আমি হাঁদারাম আর আর আপনি হাঁদারামের দাদা ভোঁদারাম!'

কথাটা যেন একটা গাঁট্টার মতই লাগলো আমার। ঠিক দেহের মাথায় না হলেও একেবারে আমার মনের মাথায়। ফুলে উঠলো আমার মন, যদিও ঠিক প্রিয় প্রিয় ভাবে যে, তা আমি বলতে পারব না। তাহলেও বেশ একটু প্রফুল্ল ভাব দেখাতে হোলো ওর কথায়।

'যাই হোক, এবার একটু পড়াশোনা করা যাক।' বলে আমি ওর একখানা বই হাতে নিলাম। পাতা ওলটাতেই আরেক রাম এসে পড়লো চোখে—'এই যে দেখছি আরেক রাম রয়েছে এখানে। সীতারাম।—সীতারাম, কী সমাস বলতে পারো ?'

'সমাস বলতে পারব না স্যার, তবে সন্ধি বলতে পারি।'

সন্ধি ? শুনে আমার তাক লাগে—বলতে কি! সীতারামের সন্ধি ? কী সন্ধি আবার ? যদ্দুর জানি, সীতা আর রামের মধ্যে সন্ধি কখনো হয় নি। বারংবার বিচ্ছেদই ঘটেছে—শেষ পর্যন্ত পাতাল-প্রবেশে পরিসমাপ্তি!

তাহলেও ওর অভিসন্ধিটা জানার কৌতূহল হলো।

'শীত ছিল আরাম—হল সীতারাম।' সে প্রকাশ করে।

'তার মানে।' আমি তো হতবাক।

'তার মানে হচ্ছে' লেপ। লেপ থাকলে শীতের মতন আরামের আর কিছুই নেই।' বলেই ওর অনুসন্ধিৎসা' আর চকোলেট আছে স্যার ?'

'নাঃ। সীতারামের সন্ধি হয় না' সমাস হয়। দ্বন্দ্বসমাস। সীতা এবং রাম—।'

'অনেক পড়া হয়ে গেল স্যার।' সে বাধা দিয়ে বলে ঃ 'আজ আর না। আমি চললাম। মা ডাকছে।'

'কখন ডাকলেন মা ? শুনলাম না ত।'

'মা আমায় সব সময় ডাকে। আমার পেটের মধ্যে সাড়া পাই। খিদে পেলেই বুঝতে পারি।' বলে সে, 'তখন খেতে দাও বলে মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই হোলো—আমার পেটের খবর, কেমন করে জানি না, টের পায় মা।'

বলেই সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর আর দাঁড়ায় না। বাড়ির ভেতর চলে যায় সটান।

পরদিন পড়াতে গিয়ে হাঁদারামের আর পাত্তা নেই। বহুৎক্ষণের পর ফিরলে শুধাই আমি—'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

'বাজার করতে গেছলাম স্যার।' ব্যাজার মুখে সে জানায়—বিচ্ছিরি কাজ এই বাজার করা। কী বলব!'

'হ্যাঁ। বাজার করায় হাজার ঠেলা।' আমি বলি। বলতে গিয়ে আমার নিজেরই একখানা বইয়ের নাম মনে পড়ে যায়।

'ঠেলা বলতে! প্রথমে ত চালওয়ার কাছে গেলাম, চাল নিয়ে তার পাওনা মিটিয়ে দিলে সে বললে, খোকাবাবু, এ টাকা চলবে না। আমি বললাম, চলবে না তা আমি জামি। এটা তো দিলাম আপনার কাঁকরের দাম। গেলবার বাবার কাছে বলেছিলেন চালে কাঁকর নেই, যদি থাকে বেছে নেবেন। চাল বলে কাঁকর চালতে পারেন আর অচল নোট চালাতে পারবেন না! চালিয়াৎটা আমার সঙ্গে চাল

মারতে আসে ! তারপর গেলাম মসলার দোকানে—?'

'হয়েছে, বুঝতে পেরেছি। পড়তে বসো এখন।' আমি বাধা দিই। আরও ওর মালমসলা করবার সুযোগ দিই না ওকে।

'চকোলেট এনেছেন ?' বলেই সে হাত বাড়ায়। তারপর নিয়ে মুখের মধ্যে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে মুখস্থ করতে করতে বলে—'আজ আর দ্বন্দ্ব সমাস-টমাস নয় স্যার। বাজারে আজ অনেক দ্বন্দ্ব অনেক সমাস হয়েছে চালওলার সঙ্গে, আলুওলার সঙ্গে, মসলাওলার সঙ্গে—বাজার করলে বেজায় খিদে পেয়ে যায়। মা ডাকছে, আমি চললাম।' বলেই চকোলেট মুখে সে উধাও।

এই ভাবেই গড়াচ্ছিল পড়াশুনা। অবশেষে সেই দিনটি এলো—শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি। ওর বার্ষিক পরীক্ষার দিন।

আমার অগ্নিপরীক্ষার দিনটাও প্রায় ঘনিয়ে এসেছিল। মাসকাবারে মাইনে পাবার দিন আমার।

'আজ কিসের পরীক্ষা ছিল ? কেমন দিলে ?' ওকে শুধালাম।

'ভূগোলের পরীক্ষা ছিল স্যার। লিখে দিয়েছি।'

'লিখে তো দিয়েছো। কি রকম লিখেছ শুনি একবার।'

'কি রকম আবার ! টুকে ফাঁক করে দিয়েছি স্যার—'সে বলে। 'পাশে যে ছেলেটা বসে পরীক্ষা দিচ্ছিল, তার থেকেই টুকলাম স্যার।'

'সে কি হে ! টুকে উত্তর লিখলে ? হুবহু এক হলে ধরা পড়ে যাবে যে।'

'আপনি আমাকে অত বোকা পেয়েছেন মাস্টারমশাই ?' মুচকি হেসে জানায় সে—'একটু কি আর ইদিক-উদিক করে দিই নি আমি।

হাঁদারাম নামে যাই হোক না, আর চেহারায় তাই দেখালেও আসলে ততটা সার্থকনামা সে নয়, তার কথায় জানা যায়।

'কি রকম ইদিক-উদিক ?' শুধাই তবু।

'যেমন প্রশ্ন ছিল, হিমালয় ভারতের কোন দিকে অবস্থিত ?—' সে নিজের সদুত্তর প্রকাশ করে : 'ভজা লিখেছে দেখলাম—উত্তর দিকে। আমি ওর উত্তরটা পালটে দক্ষিণ দিক করে দিয়েছি। আর,

বঙ্গোপসাগর কোথায়? তার জবাবে ও লিখেছে বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। আমি সেটাকে উত্তরে এনে বসিয়েছি।'

'সমুচিত উত্তর দিয়েছো।' মানতে হোলো আমায়। তারপর আর প্রশ্ন করার সাহস আমার কুলোল না।

এর মধ্যে ওর বাবা এসে পড়লেন।—'কেমন এগজামিন দিচ্ছে আপনার ছাত্র? কালই ওর বার্ষিক পরীক্ষার ফল বার হবে খবর পেলাম। তারপরই আপনার মাইনে পাবেন প্লাস আপনার ঐ ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স—পরীক্ষার ফলটা দেখেই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বলেই আমি উঠি। উঠেই 'নমস্কার!' জানিয়ে সরে পড়ি সেখান থেকে। পিতা আর পুত্র দুজনকেই একসঙ্গে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিই। দুজনকে, যুগপৎ আমার করজোড়!

'আমি আর ওমুখো হচ্ছি না মশাই!' নীলকৃষ্ণবাবুকে জানাই তারপর।

'সে কি মশাই!' পরশু আপনার মাইনে পাবার দিন না?' শুনে তিনি অবাক হন: 'মাইনে না নিয়েই—সে কি?

'আমি আর পরশুরাম হতে যাচ্ছি না সেখানে।' আমার সাফ জবাব।—'অমন ছেলের সঙ্গে বেশি মিশলে আমার উত্তর-দক্ষিণ জ্ঞান লোপ পাবে। কাণ্ডজ্ঞান হারাব আমার।'

'সে কি! গাঁট্টা না খেলেও—এক পায়ে না দাঁড়াতে হলেও' আপনি অমন হাঁদারামকে হাতে পেয়ে ছাড়লেন! তাও আবার মাইনে না নিয়েই। একটি টাকার ওপর আরো ছিল তো আপনার বেলায়। এক চোটে সব খোয়ালেন আপনি? আপনি ত হাঁদা-রামের দাদাই দেখছি।

'তা যা বলেন!' ছেলেটাও ঠিক ঐ কথাই বলেছিল মনে পড়ে যায় আমার।

মাইনের জন্য না। তিরিশখানা চকোলেটের শোকেই বেশি কাতর করে আমায়। নিজে খেলে কাজ দিত—গায়ে একটু শক্তি লাগতো আমার—আরো একটু মোটা হতে পারতুম—সত্যি! আরো একটু মোটা।

পাখোয়াজ ছেলে

বাংলার স্যার ক্লাস ছেড়ে যেতেই না সেই ছেলেটা এসে আমাদের ক্লাসে ঢুকল। চিনি নে আমরা কেউ তাকে, কখনো তাকে দেখি নি। কোন্ ক্লাসের কে জানে ; আমাদেরই বয়েসী তবে মাথায় বেশ ঢ্যাঙা। এসেই না সে বেঞ্চির উপর খাড়া হয়ে মাথার ওপরকার পাখাটায় তার হাত লাগলো।

সিলিং ফ্যান্‌টা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে দিল সে।

পাখাটা কদিন থেকে খারাপ হয়ে আছে, মোটেই ঘুরছে না, সুইচ্ অন্ করলেও নয়, তার ওপর তাতে হাত লাগিয়ে তাকে আরো খারাপ করার কোনো মানে হয়? তার এই হস্তক্ষেপ আমাদের ভালো লাগে না।

'কী করছো তুমি পাখাটা নিয়ে? হচ্ছে কী?' আমরা জিজ্ঞেস করি।

'দেখছি পাখাটাকে।'

বলে সে পাখাটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করে, ব্লেডগুলোকে হাতের ধাক্কায় ঘুরিয়ে দেয়, তিন পাক ঘুরে আবার থেমে যায় পাখাটা। তারপর ঘুরে ফিরে থেমে যায় আবার!

'সুইচটা টিপে দাও তো হে!' দরজার কাছের ছেলেটাকে এ কথা বলতে সে হাত বাড়িয়ে সুইচ্ অন্ করে দিল।

আবার সে একটা পাক মারলো পাখাটাকে।

বার কয়েক ঘুরপাক খেয়ে পাখাটা থেমে গেল আবার।

'আমরা অনেক অমন করেছি হে!' আমি জানালাম : চলে নি তাতে! আর তুমি চালাবে! খারাপ হয়ে গেছে পাখাটা দেখতে পাচ্ছ না?'

'তাই তো দেখছি।' সে বললে, 'কারবোন খারাপ হয়েছে।'

'কার বোন খারাপ হয়েছে ? কার বোনের কথা বললে তুমি ?' শুনেই আমি চটে যাই। 'আমার বোন বিনির বিষয়ে যদি কিছু বলে থাকো তো তোমাকে আমি আস্ত রাখব না।'

'কারো বোনের কথা আমি বলছি না। আমি বলছি কারবোনের কথা। পাখার মধ্যে থাকে।'

'পাখার মধ্যে যার ভাইবোন থাকে থাকুক, তার বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।' আমি জানাই, 'আমার বোন না তুললেই হোলো।'

'তোমরা যা বলো ভাই বলো! পাখা নিয়েই আমার কাজ। বুঝলে ভাই ?' বলল ছেলেটা।

'পাখোয়াজ ছেলে!' পাশের থেকে পলি বলে উঠল : 'বাংলার স্যার বলে না ? যে একেকটা ছেলের পাখা গজায়—যারা এঁচোড়ে পেকে যায় ? বলে না স্যার ? এ হচ্ছে সেই এক নম্বরের পাকা ছেলে।'

'পাকা ছেলে নই, পাখার ছেলে।' ছেলেটি প্রতিবাদ করে।

'একই কথা।' দু'জনের কথায়ই আমি সায় দিই।

ইতিহাসের স্যার রসময় মাষ্টার ক্লাসে এলেন তার পরেই।

আমরা সবাই দাঁড়িয়ে উঠলাম। ছেলেটা তেমনি বেঞ্চির ওপর খাড়া থাকলো, নেমে দাঁড়ালো না।

রসময়বাবু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকে দেখলেন—তাকিয়ে থাকলেন খানিক—তার পরে বললেন—'ওহে! তুমি বেঞ্চির ওপর অমন করে দাঁড়িয়ে কেন ?

ছেলেটি কোনো জবাব দিল না। কী জবাব দেবে ? আমাদের ইস্কুলের ছেলে তো, যে ক্লাসেরই হোক্ না, রসময়বাবু কেমন কড়া মাষ্টার জানা আছে সবার। তার কাছে ওই সব পাকা পাকা কথা, পাখার কথা পাড়লেই হয়েছে আর কি!

'আগের মাষ্টার ওকে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে গেছেন বুঝি ?' স্যার শুধলেন আমাদের—'এ ঘণ্টাতেও ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ? পড়া পাড়ে নি বোধহয় ?'

আমরা কোনো জবাব দেবার আগেই উনি বলে ওঠেন আবার—'কিন্তু আমার ঘণ্টায় দাঁড়াবে কেন শুনি ? আমার পড়া না পাড়লে আমি দাঁড় করাবো। আমার ঘণ্টায় অন্য টীচারের দাঁড় করাবার কী এক্তিয়ার ?'

আমরাই বা তাঁর এ কথার কি জবাব দেব ? চুপ করে আছি। কিন্তু তিনি চুপ করে থাকেন না। চেঁচিয়ে ওঠেন—'ওহে। স্ট্যাণ্ড ডাউন। স্ট্যাণ্ড ডাউন ফ্রম দা বেঞ্চ।'

আমি ছেলেটার হাত ধরে টেনে নামিয়ে দিই। বসিয়ে দিই আমার পাশে—'বসে পড়ো বসে পড়ো। রাগ করছেন স্যার—দেখছ না!'

'আমার ক্লাসের ছাত্রকে আমার ঘণ্টায় দাঁড় করাবার অন্য টীচারের কী অধিকার ?' গর্জে ওঠেন ইতিহাসের স্যার ঃ 'দাঁড় করাতে হয় আমি করাবো। আমার পড়া পারে কি না দেখি আগে।'

পাতিহাসের মত তিনি প্যাঁক প্যাঁক করে ওঠেন।

'ওহে বলো তো! আলেকজাণ্ডার সম্পর্কে কী জানো বলো দেখি ?' শুধান তিনি ছেলেটাকে।

'লালঝাণ্ডার কথা বলছেন—আজ্ঞে ?' বেঞ্চের ওপর বসেই ছেলেটা জবাব দেয়।

আমি ঠেলা দিয়ে তুলে দিই ছেলেটাকে।—'বসে বসে জবাব দেয় নাকি হে ? দাঁড়িয়ে উঠে স্যারদের সঙ্গে কথা কইতে হয়, তাও শেখ নি ?'

ফিস করে কই ওর কানের গোড়ায়।

ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়—'আমরা লালঝাণ্ডার দলে নেই মশাই।' সে জানায়।

'লালঝাণ্ডার সঙ্গে আলেকজাণ্ডার! তার মানে ?' হতবাক হন রসময় মাষ্টার ঃ 'গুলিয়ে ফেলেছ বোধ হচ্ছে। পুরু ? পুরু কে ছিল ?'

'এক ইঞ্চিও না। লালঝাণ্ডা আর কত পুরু হবে মশাই ?' এবার সে দাঁড়িয়ে উঠেই বলে—'লম্বা চওড়ায় কয়েক হাত হতে পারে কিন্তু পুরু নামমাত্র।'

'পুরু নামমাত্র ? ইতিহাস-বিখ্যাত নাম পুরুর, তুমি তাকে বলছ নামমাত্র ?' এবার তিনি বিস্ময়ের ভারে ভেঙে পড়েন—'তার ওপর বলছ আবার এক ইঞ্চিও নয়।'

'এমন কি আধ ইঞ্চিও না। ছেলেটি কিঞ্চিৎ সংশোধন করে এবার : 'কাপড় আর কতো পুরু হবে বলুন না ?'

'কাপড় ? কাপড় তুমি পাচ্ছো কোথেকে ?' ইতিহাসের স্যার যেন আকাশ থেকে আছাড় খান।

'কেন, ঐ পতাকার থেকেই। পতাকার থেকে কাপড় কিম্বা কাপড়ের থেকে পতাকা যাই বলুন না! একই কথা।'

'প-তা-কা!' মাষ্টারমশাই বিস্ময়ের থই পান না। থ হয়ে যান।

'আচ্ছা, নাদির শা কে ছিলেন ? নাদির ?' ইতিহাসের প্রশ্নটা পালটান তিনি এবার।

'ছাগলের।' ছেলেটি অম্লানবদনে জানায়।

'ছাগলের !···ছাগলের !!···ছাগলের !!! পাগলের মত ভাবভঙ্গী প্রকাশ পায় তাঁর—'পাগল করে দেবে দেখছি ছেলেটা।'

'কেন মশাই, পাগলের কি হলো ?' সে জানতে চায়, 'আপনি নাদির কথা জিজ্ঞেস করলেন আমি বলেছি ছাগলের—তা ভুলটা হোল কোথায় শুনি ? নাদি তো ছাগলেরই হয়ে থাকে। ছাগলের নাদির কথাই জানি আমরা।'

'ছাগলের নাদির!' কপালের ঘাম মোছেন স্যার।

'কোথাকার পাঠা!' পলি ফিসফিসায় এ পাশ থেকে।

'আপনি কি বলছেন তবে গোরুর ? গোরুর তো নাদি হয় না, যদ্দ র জানি, গোরুর হয় গোবর। হাতীর বেলাও তা বলে না— কেন না হাতীর হয় নাদা নাদা! তবে মানুষের বেলায় কী বলে তা আমি বলতে পারব না।'

গুহ্য কথাটা ব্যক্ত করতে বোধহয় তার মুখে রাধে। সেটা হয়ত তার শালীনতারই পরিচয় হবে।

'হয় তোমার মাথা।' মাষ্টার মশায় রাগে ফাটেন 'তোমার মাথা-ভর্তি যা।'

'আজ্ঞে না···মানুষেয় বেলা···মানুষের বেলা···' ছেলেটা ভেবে ঠাওর পায় না—'মানুষের তো গোবর হয় না, নাদিও হয় না।'

'নরবর হবে বোধহয়।' আমি ফিস ফিস করে বলি।

'সে তো শুধু বরের বেলায় হয়ে থাকে। বিয়ের টোপর মাথার চেয়ে বড়ো হলে নড়বড় করে আমি দেখেছি।'

'তোমার মুণ্ডু। ইতিহাসের ক্লাসে তুমি আগাগোড়া ফাঁকি দিয়ে এসেছো—বুঝতে পারছি। পাতাই ওলটাও নি ইতিহাসের। আচ্ছা, শুধু আর একটা প্রশ্ন তোমায় জিজ্ঞেস করব। পলাশীর বিষয়ে কী জানো তুমি বলো—এতো এই সেদিনের কথা।'

'কিচ্ছু জানি না।' সে ব্যক্ত করেঃ 'চিনিই নে তাকে।'

'কিচ্ছু জানো না? আশ্চর্য! এই সেদিন আমি পড়ালাম—গত শুক্রবার। এর মধ্যেই ভুলে মেরে দিয়েছো? পলাশীযুদ্ধের বিষয়ে তুমি কিচ্ছু জানো না! আশ্চর্য! পড়া না করে এসেছো কেন ক্লাসে? বাড়িতে পড়ো না বুঝি একদম? কাল রাত্তিরে কী করছিলে?

'সিনেমা দেখতে গেছলাম মশাই! খাসা ছবি ছিল একখানা!'

'সিনেমা দেখতে! এই কথা বলছ তুমি আমার মুখের ওপর? স্পর্ধা তো তোমার কম না। পড়া না করে আমার ক্লাসে এসেছ কেন তাহলে?

'ইচ্ছে করে আসিনি আমি। আমাদের কারখানার থেকে পাঠিয়েছে আমায়।

'কারখানা থেকে!'

'ছেলেটার কথায় আর তার কাণ্ড দেখে—এককথায়, তার কাণ্ড-কারখায় ক্লাস শুদ্ধু সবাই আমরা অবাক হয়ে যাই।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কারখানার থেকে পাঠিয়েছে। আপনার ইস্কুলের

ছেলে নই, কারখানার ছেলে আমি।

'ইয়ার্কি দিতে এসেছো এখানে? নিজের ক্লাসে নতুন ইতিহাস ঘটতে দেখে রসময়বাবু বিরস মুখে বিরক্তি প্রকাশ করেন।

এই ক্লাসের পাখাটার কারবোন বদলাতে এসেছি।

আপনাদের সিলিং ফ্যান সারাবার জন্যে পাঠিয়েছে আমায়।